



আলোকধারা

রেজিঃ নং চ-২৭২

২৮তম বর্ষ

১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২২ ঈসাব্দ

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

মহান ১০ মাস
হজুর গাউসুল আযম মাহিজ্জাভারীর
পবিত্র উর্দু শরীফ উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা



তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীর উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিণী অগণিত আশেক-ভক্তের মহীয়সী আম্মাজান উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর জানাযার চিত্র



লাখে আশেক-ভক্তের মহীয়সী আম্মাজান উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর জানাযার পূর্বে সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান রাহবারে আলম শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)

৩৩তম মহান ২৬ আশ্বিন উরস শরিফ ২০২১-এ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর পবিত্র রওজায় মিলাদ মাহফিলে সম্মানিত সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসূল (দ.) রাহবারে আলম শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)



৫ ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার: নগরীর জাকির হোসেন রোডস্থ 'খুলশী কনভেনশন হল' (কর্ণফুলী হল)-এ 'মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন' উপলক্ষে রিপাবলিক অব টার্কি'র বাংলাদেশ দূতাবাস, টার্কি অনারারী কনসাল জেনারেল অব চিটাগাং এবং 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট'-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় "Roadmap to sustainable peace: Maulana Jalaluddin Rumi's Path" শীর্ষক সেমিনার ও সুফি সংগীত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি রিপাবলিক অব টার্কি'র বাংলাদেশ এম্বেসির অ্যাম্বাসেডর জনাব এইচ ই মোস্তফা ওসমান তুরান এবং সভাপতি মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি আওলাদে রাসূল (দ.) হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)



৩০ ডিসেম্বর ২০২১: সুনামগঞ্জ জেলাধীন 'মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ' দোয়ারাবাজার শাখার তত্ত্বাবধানে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)'র 'হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)' নামে ৯ম দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব দেবাংশু কুমার সিংহ

আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২২ ঈসায়ী

জমা: আউয়াল-জমা: সানি ১৪৪৩ হিজরী

পৌষ-মাঘ ১৪২৮ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও তুরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

অধ্যাপক জহুর উল আলম

যোগাযোগ:

০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২৫ টাকা \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট

পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয় ----- ২
- 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)'-এর বিবৃতিঃ
'কোরআন জিম্মি করে দেশে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে উদ্বেগ'-----৪
- 'আম্মাজান'
(উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহমাতুল্লাহ আল্লাইহা)-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত সালামী)
মোঃ মাহবুব উল আলম -----৫
- মহান ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৯৩তম খোশরোজ শরিফে রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র আশিষ বানী -----৯
- বেলায়তে মোত্লাকা (সপ্তম পরিচ্ছেদ)
খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
বেলায়তের দুই যুগের বিকাশ : বেলায়তে মোকাইয়াদা এবং বেলায়তে মোত্লাকা ----- ১৭
- উম্মুল মু'মিনিন হযরত জুয়াইরিয়া বিন্তে হারিছ (রা.)
মোঃ গোলাম রসুল ----- ২১
- আহলে বাইতে রাসূল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ
অধ্যাপক জহুর উল আলম -----২৩
- গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র বানী ----- ৩১
- গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার তথ্য ----- ৩২
- আহলে সন্নাত ওয়াল জামায়াত এর চেতনা বিকাশের পথিকৃৎ হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ----- ৩৩
- সশ্রদ্ধ স্মরণ : অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
জাবেদ বিন আলম -----৩৯
- চির দীপ্যমান শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
শওকত হাফিজ খান রুশ্নি -----৪২
- আল্লাহুর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম : পলিটিক্যাল ইসলাম বলে কিছু নেই
আলোকধারা ডেস্ক -----৪৪
- ফতুহাতে মক্কিয়া
অনুবাদ : আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী -----৪৮
- 'আয়নায়ে বারী' কিতাবের ভাবার্থ
এস এম এম সেলিম উল্লাহ -----৫৩
- ফিকহ শাস্ত্রঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
সৈয়দ আবু আহমদ ----- ৫৭
- হে অতীত কথা কও -----৬০
- শিশুতোষ : অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ : শিশুর মনের কথা বুঝুন
আরেফিন রিয়াদ -----৬২
- পাঠক মতামত : আলোকধারা বুকস-এর "ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকলন"
মোঃ মফিজ উদ্দিন -----৬৪

সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকরিয়া। মহান ১০ মাঘ উপমহাদেশের প্রখ্যাত অধ্যাত্ম সাধক ও বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত তুরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম খাতেমুল অলদ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ১১৬তম উরস শরিফকে উপলক্ষ্য করে নতুন খ্রিস্টবর্ষ ২০২২ সালের আলোকধারা ২৮তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ হলো। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সকল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র সর্বজনীন হেদায়ত পন্থার আলোকে মহান পয়গাম নিয়ে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আবির্ভাব সময়ে পৃথিবীবাসীর মধ্যে বিভক্তি-বিভাজন এতো তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সর্বত্র পারস্পরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার যুদ্ধংদেহী আয়োজনে মানুষমাত্র অসহায় জীবে পরিণত হয়। মনুষ্যত্বের মৌলিক মূলধন হচ্ছে নৈতিকতা। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত আকদস কেবলা আলমের আবির্ভাবকালে পৃথিবী জুড়ে মানব সমাজে নৈতিক অধপতন চরম আকার ধারণ করে। পৃথিবীর সর্বত্র অনৈতিকতার বর্বর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে মানবজাতির সংশোধনের লক্ষ্যে নৈতিকতা এবং মানবিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু বিষয়টির পুনঃঘোষণা জরুরি হয়ে পড়ে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মানবজাতির আন্তিক্যবাদের অনন্য প্রতিনিধি হিসেবে এক আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্য প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তাওহীদকে একক এবং একমাত্র নিশানা হিসেবে ঘোষণা দেন। আমরা তাঁর এ মহান আহ্বানের প্রতি পৃথিবীবাসীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মহান মাঘের এ সময়ে আমরা শোকাভিভূত ভাষায় জানাচ্ছি যে বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী, উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) ৬ অক্টোবর, ২১ ভাদ্র, ২৮ শে সফর এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালে অগণিত ভক্ত আশেকানের মতো আমরা ব্যথিত এবং শোকাভিভূত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশার্থে আলোকধারার এ বারের সংখ্যায় সাংবাদিক মো. মাহবুব উল আলম এর লিখা 'আম্মাজান' প্রবন্ধটি ছাপানো হলো। আলোকধারা'র তত্ত্বাবধানে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির উদ্যোগে উম্মুল আশেকীন'র স্মরণে বিভিন্ন আশেক ভক্ত বিশেষ করে মহিলাদের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের ভিত্তিতে স্মরণিকা প্রকাশের বিষয়টি ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আছে।

আলোকধারা'র জানুয়ারি ২০২২ সংখ্যায় এবার ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ কর্তৃক বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের সারানুবাদের অষ্টম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে। নবী রাসূলের জীবন প্রবাহে তাসাওউফ জগৎ এর একটি অধ্যায় হিসেবে আহলে বাইতে রাসূল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ শিরোনামে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)'র সুফি জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক জহুর উল আলম। ধারাবাহিকভাবে উম্মুল মু'মিনিন হযরত জুয়াইরিয়া বিন্তে হারিস (রা.)'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে লিখেছেন মো. গোলাম রসূল। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনাদর্শ ভিত্তিক নিবন্ধ "আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াত এর চেতনা বিকাশের পথিকৃৎ

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে লিখেছেন আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল। ২রা মাঘ অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোকুরা হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণে জাবেদ বিল আলম লিখেছেন "সশ্রদ্ধ স্মরণ: অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। ১০ পৌষ বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৯৩তম খোশরোজ শরিফে গাউসিয়া হক মনজিলস্থ শান্তিকুঞ্জ মাঠে রাহবারে আলম হযরত শাহ সুফি সৈয়াদ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) প্রদত্ত ভাষণটি লিখিত আকারে প্রকাশ এবং জনাব শওকত হাফিজ খান রুল্লি'র ১৯৯৪ সালে ছাপানো ভক্তি নিবেদনমূলক নিবন্ধটি এবার "হে অতীত কথা কও" ধারণা নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছে। আলোকধারা ডেস্ক এর এবারের প্রতিবেদন-আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম : পলিটিক্যাল ইসলাম বলে কিছু নেই। চলমান অনুবাদে রয়েছে শায়খুল আকবর (রহ.)'র ফতুহাতে মক্কিয়া এবং হযরত সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রহ.)'র আয়নায়ে বারী, যা সম্পন্ন করছেন যথাক্রমে আবরার ইবনে সেলিম এবং এস এম এম সেলিম উল্লাহ। ইসলামী শাস্ত্র জ্ঞানের অন্যতম শাখা ফিকহ সম্পর্কে লিখেছেন সৈয়দ আবু আহমদ। আলোকধারার প্রাথমিক সময়ে লিখা-লিখিতে জড়িত বিশিষ্টদের স্মরণ রাখার তাগিদ হিসেবে চালু করা হয়েছে; 'হে অতীত কথা কও' কলাম। এবার এ কলামে আলহাজ্ব বজলুস ছত্তার এবং সৈয়দ আমিরুল ইসলাম বিসিএস'র নিবন্ধ এবং কবিতা ছাপানো হলো। শিশুতোষ প্রতিবেদন লিখেছেন আরেফিন রিয়াদ। পাঠক মতামত লিখেছেন মো. মফিজ উদ্দিন। সবকিছু মিলে এবারের আলোকধারায় রয়েছে ভিন্ন মাত্রিকতা। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আলোকধারা ইসলাম ধর্ম, তাসাওউফ, মানবতাবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা নিয়ে নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজনে সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় উৎসব অনুষ্ঠান দুর্গাপূজার সময়ে কুমিল্লাসহ কতিপয় এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির এবং বসত বাড়িতে হামলা এবং অগ্নিসংযোগ হয়েছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল- কোরআনের অবমাননা সম্পর্কিত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অনেক নিরাপরাধ বাংলাদেশী নাগরিকের জীবন-সম্পত্তি এবং বসতগৃহে হামলা কোন অবস্থায় ধার্মিকতা নয়। কারণ বাংলাদেশের কোন সুস্থ, বিবেচক, ধর্মপরায়ণ নাগরিকের পক্ষে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিন্দু পরিমাণ অবমাননা করা যেমন অসম্ভব, তেমনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিনষ্টের মতো রাষ্ট্র বিরোধী কোন অপকর্মে লিপ্ত হওয়া অসঙ্গত। আমরা মনে করি ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যারা অপকর্মে জড়িয়ে থাকে তাদের মনুষ্যত্ববোধ অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। এরা বর্বর দানব। এদের অপকর্মের প্রতিবাদ করার নিন্দনীয় ভাষা আমাদের জানা নেই।

এ ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এসজেডএইচএম ট্রাস্ট এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)। তাঁর সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে আমরা ঐক্যমত পোষণ করি এবং বিচারের মাধ্যমে দুর্বৃত্তদের শাস্তি দাবি করছি।

আমরা শোকাভিভূত

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী, অগণিত আশেক-ভক্তের পরম শ্রদ্ধাষ্পদ মহীয়সী 'আম্মাজান' উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)'র ইত্তিকালে গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি, আলোকধারা বুকস, যাকাত তহবিল, মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী, বৃত্তি তহবিল, দুস্থ সহায়তা তহবিল, তাজকিয়া, আলোর পথে, দি মেসেজ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছে। এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ভুক্ত সকল সংগঠন পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে মরহুমার রাফ'ই দারা'জাত দান করার আর্জি পেশ করছে।

তাঁকে অনন্ত হেফাজতে রাখুন। আমিন!

উম্মুল আশেকীন স্মরণে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর কর্মময় জীবন, আশেকীনদের সঙ্গে পরিচয়, যোগাযোগ এবং মতবিনিময় সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি স্মারক সংকলন প্রকাশের বিষয়ে আলোকধারা কর্তৃপক্ষ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উম্মুল আশেকীনের সঙ্গে জড়িত ঘটনা প্রবাহ এবং স্মৃতিকথা নিয়ে তথ্য দিয়ে ইচ্ছুক লেখক-লেখিকাদেরকে সহযোগিতার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে মহিলা ভক্তদের স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট কার্যালয় / মাসিক আলোকধারা সম্পাদক সমীপে অথবা ই-মেইল: sufialokdhara@gmail.com প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

‘শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
(এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)’-এর বিবৃতিঃ

‘কোরআন জিম্মি করে দেশে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে উদ্বেগ’

মন্দিরে পবিত্র ‘কোরআন’ রেখে উত্তেজনা ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা সৃষ্টির মতলবে অশুভ মহলবিশেষের সাম্প্রতিক অপতৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ‘শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এক বিবৃতিতে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, এ ঘটনা যুগপৎ কোরআন ও ইসলামের অবমাননা এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের কপালে কলঙ্কতিলক অঙ্কনের সামিল। পুরো বিষয়টা ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শ, সামাজিক নীতি ও নৈতিক আচরণের পরিপন্থি। রাষ্ট্রে মুসলিমদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচার পালনসহ মৌলিক মানবাধিকারগুলো মদিনা সনদের বিধিবদ্ধ এবং এতে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটানোর অবকাশ নেই। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফসহ মহান অলি-আউলিয়াগণ এ পবিত্র ঐতিহ্যের ধারক এবং বাংলাদেশের সামাজিক নীতিও তাই।

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট হিন্দু নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি, যাতনা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ করার সুপারিশ জানান। তিনি এ সংবেদনশীল অপকর্মের অন্তরালে কোন প্রকার অন্তর্ঘাত সক্রিয় কিনা তা কঠোরভাবে নজরদারি ও প্রতিকারের পদক্ষেপ নেবার আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের সকল ধর্মাবলম্বীর সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করেন এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শান্তি, স্থিতিশীলতার জন্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ জানান।

‘আম্মাজান’

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহমাতুল্লাহ্ আলাইহা)-এর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত সালামী

মোঃ মাহবুব উল আলম

১. আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে : “নবী মু’মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতৃস্বরূপ (৩৩:৬)। “হে নবী পত্নীগণ! আপনারা অন্য নারীদের মতো নন। আপনারা স্বর্গহে অবস্থান করুন এবং পূর্বতন জাহেলী প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেন না; সালাত কয়েম করুন, যাকাত প্রদান করুন, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন; হে নবীর গৃহবাসিনীগণ! আল্লাহ্ তো কেবল আপনাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে পবিত্র রাখতে চান (৩৩:৩৩)।

পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের একমাত্র জাগতিক ভিত্তি ‘উম্মু’ অর্থাৎ ‘মা’। আল্লাহ্র বেমিসাল কালিমা (নিদর্শন) হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছা ও হুকুমে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও মাতৃগর্ভের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা দৃশ্যমান। অতএব, ‘উম্মু’ বা মা মানব অস্তিত্বের শস্যক্ষেত্র (হারছুন) এবং একমাত্র অবলম্বন। তাই কুরআন ও নবীজীর (দ.) সুন্নাহ্ নারী জাতির সুরক্ষা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল। নবীজীর (দ.) বিশ্লেষণে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি। এই বিশ্লেষণের পাশাপাশি মানব অধ্যয়নজাত বিজ্ঞানের বিবরণের কথাও ধরা যাক। সূরা নিসা-র প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে : “হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে অভিন্ন নফস বা প্রাণসত্তা (নফসে ওয়াহেদাত) থেকে সৃষ্টি করেছেন।” ‘নফসে ওয়াহেদাত’ শব্দ দুটোর মধ্যেই কেবল পুরুষের নয়, নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্যের তথ্য গচ্ছিত আছে।

আল-কুরআনের সর্বত্র ‘নফস’-এর পরপর ব্যবহৃত শব্দটা ‘ওয়াহেদাত’। ‘ওয়াহেদাত’- শব্দটার রূপ স্ত্রী লিঙ্গ। তফসীরে তাবারীতে এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক আলোচনা পরিবেশিত আছে। অতএব, সৃজনশীলতার সাথে আল্লাহ্ নারীত্বকে অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্যতার বিষয় হিসেবে মোহর মেরে দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর একাধিক মরমী গবেষক সাধক আল-কুরআনের বয়ানের অনুসরণে

Materia prima বা cosmic substance হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নারীর উপর অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আল-কুরআনের নির্দেশিত এই নিখাদ বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

নবী পত্নীগণকে আল-কুরআনে মুমিনদের মাতৃস্বরূপ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার সূত্র (proposition) ধরে নবীজী (দ.) পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, জাগতিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে গেছেন এবং তা হলো : “আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে; তারা তোমাদের মাতা, কন্যা ও মাতৃস্বরূপ... নারীর অধিকারগুলো পবিত্র। লক্ষ্য রাখো, নারীগণ যেন তাদেরকে প্রদত্ত অধিকারগুলোতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন”- (আল-হাদিস)।

২. ‘আম্মাজান’ শীর্ষক এই নিবন্ধের অবতরণীকায় প্রথমে আল-কুরআন, হাদিস এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আলোকে নারী জাতির পৃথক অথচ অতি মৌলিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সুস্পষ্ট করার চেষ্টা, নারী পুরুষের কর্তব্য-অধিকার-দায়িত্বের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে, লক্ষ্যণীয় যে, সেখানেই নারী ও পুরুষের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করেই বয়ান বর্ণিত হয়েছে। এটা আল্লাহ্র এই দুই সৃষ্টির একাধিক মৌলিক পার্থক্য, মর্যাদা ও অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিতবহ। নবীজীর (দ.) ইসলাম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহান খোলাফায়ে রাশেদা এবং এরপর মাত্র তিন শতাব্দী কাল ধরে মুসলিম মনীষীরা এসব বিষয়সহ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের স্থানিক, কালিক ও পরিবেশগত প্রায়োগিক বিষয়টি নিয়ে ফলপ্রসূ উপযোগী গবেষণা করলেও দীর্ঘ বহু শতাব্দী এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার সাক্ষাৎ পায়নি। বিংশ শতাব্দী থেকে মুসলিম জাতি এবং অন্যান্য জাতির বিজ্ঞ গবেষকরা এসব বিষয়ে হাত দিয়েছেন।

সূরা আহযাবের ৬ নং আয়াতে নবী পত্নীদেরকে মুমিনদের মাতৃস্বরূপ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করার সূত্র ধরে আমাদের

মহান বিজ্ঞ পূর্বসূরীরা নবীর ওয়ারেছদের অর্থাৎ পীর-বুজুর্গ-ওলী আল্লাহদের পত্নীদের ক্ষেত্রেও ‘মাতৃ পদবী’ আরোপের সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রবর্তন করেছেন। অবশ্যই অন্যান্য ধর্মের সিদ্ধপুরুষগণের পত্নীগণ, এমন কি সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের পত্নীগণও ‘মাতৃস্বরূপে’ অভিহিতা, সম্মানিতা ও মান্যতা পদে অভিষিক্তা হয়ে আসছেন। অতএব, ধর্মীয় ও লোক-সামাজিক উভয় আলোকে মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) আমাদের ‘আম্মাজান’ হিসেবে সঙ্গতভাবেই অধিষ্ঠিতা। তিনি সমগ্র মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার সকল ওলী-আল্লাহর দরবার তো বটেই, সকল আওয়াম জনতারও মাতৃ স্থানে অধিষ্ঠিতা বাস্তবভাবেই।

৩. আম্মাজান মুনাওয়ারা বেগমসহ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সকল অন্দর-মহলের মহিলারা বিশেষ করে বাংলা মুল্লুকে গড়ে উঠা ঘরোয়া সংস্কৃতির অনুসরণে পর্দানশীন। পর্দানশীনতার সংজ্ঞা ও প্রকরণ স্থান-কাল বিশেষে কিঞ্চিৎ ভিন্নতর হলেও বাংলার মুসলিম সংস্কৃতিতে এর ব্যাকরণ একটু আলাদা। গাউসিয়া হক মন্জিল সমেত মাইজভাণ্ডার দরবারী ভূবনে পর্দানশীনতা এবং আক্ৰশালীনতার এই ঐতিহ্যবাহী রেওয়াজে কোন প্রকার শৈথিল্য নেই। সূরা আহযাবের ৫৫নং আয়াতে বর্ণিত ‘গাইড লাইন’ আম্মাজানের জানাযা ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ততাসহকারে অনুসৃত হয়েছে।

আমি ‘আম্মাজানকে’ কখনো দেখিনি। তবে তাঁর স্নেহশীতল অদৃশ্য বাতাস অনুভব করেছি আরো লক্ষ মানুষের মতো। অনুভব করেছি তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টিজাত মমতা পরায়ণতা। কাছের-দূরের সবার প্রতি প্রবাহিত ছিল তাঁর মমতার সুবাতাস। গাউসিয়া হক মন্জিলে প্রতি দিবা-রাত আগত অগণিত আশেক-ভক্ত-জায়েরীনদের যথাযথ আপ্যায়ন, আতিথেয়তা, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কেউ যাতে কোন প্রকারে নিজেকে অবহেলিত মনে না করে, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রতি ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। কোন মহিলা দর্শনার্থী-ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তাঁর দর্শন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হননি। আমার নিজ গ্রাম এনায়েতপুরের একাধিক দরিদ্র, শিক্ষা বঞ্চিত মহিলা তাঁর পবিত্র দর্শনে ধন্য হয়ে আমার কাছে আনন্দ-ভক্তিতে আপুত বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ বিমুখ হননি। কেউ নিজেকে অপাংক্তেয় মনে করেন নি।

আমার নিজ পরিবারের সদস্যরা বহুবার তাঁর সান্নিধ্য, স্নেহ,

মমতা, দোয়া, দয়া লাভে ধন্য হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বহু মহিলা তাঁর দর্শন পেয়েছেন। তাঁদের মুখে ‘আম্মাজানের সান্নিধ্যে’ কাটানো সময়ের ও স্নেহময়ী আচরণে যে বিবরণ আমি জেনেছি, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত ধারণা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মুসলিম মহিলা ভূবনে মারেফাত তাসাউফ স্তরে বিচরণকারীদের জ্ঞাত সংখ্যাও কম নয়। তাদের অবস্থান ও ক্রিয়া সমস্তরের পুরুষদের চেয়ে কম নয়। নবী পরিবারের মহিলা সদস্যদের অবস্থানকে অনন্যসাধারণ অনুচ্ছেদে স্থাপন করে পরবর্তী জেনারেশনের দিকে তাকালে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী (র.), হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.)-এর মহিয়সী আম্মাজান, হযরত মনসুর হাল্লাজের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী, হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবীর (র.) তাসাউফ দীক্ষাদাত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আল-ওয়ালীয়াহ (র.) প্রমুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই স্ব মহিমায় ভাস্বর। পর্দান্তরালে নিজ কক্ষকে ‘এবাদত গৃহে’ পরিণত করে কতো মুসলিম মহিলা যে আত্মিক উন্নতি বা উচ্চতর সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক পবিত্র, মর্যাদাসম্পন্ন মহিলার, দর্শনীয়ভাবে কিম্বা অদর্শনীয়ভাবে নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের মহতী চরিত্র, জীবন ও কর্মে উন্নত সাহিত্যের অগুনতি উপাদান মঞ্জুদ আছে। আমাদের ‘আম্মাজান’ মুনাওয়ারা বেগমের (রহ.) পদচারণা মারেফাত ভূবনেও ছিল, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আমার আছে, তবে এসব বিষয় তত্ত্বগত ও নীতিগতভাবেই ব্যক্তযোগ্য নয়।

৪. তবে এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ‘আম্মাজানের’ আগমন ছিল তাঁর মহান শ্বশুর অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক অনানুষ্ঠানিকভাবে পূর্বানুমোদিত ও প্রত্যাশিত, যার ধর্মীয় আচরণগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সাথে পবিত্র শাদীয়ে মোবারকের সূত্রে ১৯৫৫ সনের ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার। আম্মাজানের পিতা ফটিকছড়ি থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার ছিলেন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মুরীদ। “বিয়ের এক বছর পূর্বে সিকদার

সাহেব একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, তাঁর একটা মেয়ে দরবার শরিফ বিয়ে দিলে হাশরের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর মুক্তির সুপারিশ করবেন। ঐ চিঠি তখনই দরবারে পাঠানো হয়েছিল।” বিয়ের প্রাকপর্বে কথা-বার্তা চলাকালে প্রথানুযায়ী কাবিন নামা ও অলংকার সাজপাত্রের প্রসঙ্গ এলে পিতা বলেন : “মুনিবের দরবারে আমার মেয়েটা কবুল হলে অধীন চিরকৃতার্থ হই। আমার সেবা যেন চিরদিন অটুট থাকে। ভক্তের কিসের দাবি দাওয়া” [জামাল আহমদ সিকদার প্রণীত শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)], ‘চরণ সেবায় উৎসর্গ’-অধ্যায়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মহান গৃহিনী হিসেবে বদরুজ্জামান সিকদারের কনিষ্ঠ কন্যা মুনাওয়ারা বেগমের আগমন নেহাত আটপৌরে বিবাহ মাত্র ছিলনা। এতে রুহানী ও মারফতি সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়াই ছিল মুখ্য। সুতরাং, ‘আম্মাজানের’ রুহানী উরুজ অতি সহজেই কার্যকারণ সূত্র বলে অনুধাবনযোগ্য। ‘আম্মাজান’ তাঁর পূর্ববর্তী বহু মুসলিম অধ্যাত্ম মহিলা ব্যক্তিত্বের মাহফিলে সমাসীনা।

আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর অন্তর্জাত ঐশ্বর্য সাধারণ্যে দর্শনাভীত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনের তথ্যাদি হাজার হাজার উম্মি মহিলার অজ্ঞাত নয়। লোক মুখে এসব বিবরণ অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বিস্তার পেয়েছে। একজন মহতী মানবী হিসেবে তাঁর এই পরিচয় কাগজে-কলমে বিধৃত থাকার যোগ্যতা রাখে। মানুষের ব্যবহারিক জীবন তার অন্তর্জাত জীবন প্রবাহের প্রতিবিম্ব। যেসব মহিলা ‘আম্মাজানকে’ স্বচক্ষে দেখার ও সান্নিধ্যে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের সহজ-সরল জবানীর ক্যানভাসে তিনি যথার্থভাবে অঙ্কিত আছেন। বিভিন্ন সময়ে গাউসিয়া হক মন্জিলে আমার সিনিয়র হযরত সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ (রহ.) লেখক-গবেষক জামাল আহমদ সিকদার সমেত অন্যান্যদের সাথে কথা-বার্তায় আম্মাজানের ব্যবহারিক (practical) জীবনের যে ধারণা চিত্র লাভের সুযোগ হয়েছে নিবন্ধের উপসংহারে সেসব চিত্রের পুনরাবৃত্তি করছি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ‘গাউসিয়া হক মন্জিল’ শিরোনামের যে প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মাইজভাণ্ডার এবং বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে বিশাল বিশাল সেবা, চিকিৎসা,

জনকল্যাণ ও শিক্ষামূলক কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে, তার প্রথম বীজটা বপন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধেয়া ‘আম্মাজান’ মহিয়সী মহিলা মুনাওয়ারা বেগম, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিনী এবং শাহজাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম. জি. আ.) আম্মাজান। সমকালে ফটিকছড়ি থানা তথা চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম মর্যাদাশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা তিনি। আবাল্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতা। ১৯৫৫ সনের ২৮ জানুয়ারি তাঁদের শাদীয়ে মোবারক সম্পন্ন হয়। নববধূসহকারে বাড়ী ফিরে বর গিয়ে ঢুকেন রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর দিকে তৎকালীন স্যাংসেঁতে লবণ গুদামে। তিনি তখন নিরত প্রচণ্ড রিয়াজতে। সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয় এক দুঃসহ জীবনের চৌহদ্দিতে পা রাখলেন সংসার-অনভিজ্ঞা নববধূ। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার! সংযম ও ধৈর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন দরবার শরিফ মহল্লা থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের আশেক-ভক্তসহ সবার কাছে। সবার অলক্ষ্যেই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে ওঠেন সকলের। একজন মহান অধ্যাত্ম সাধকের ঘরণী হবার কঠোরতা, ঝঙ্কি সইবার মতো ধৈর্য, মনোবল, সহিষ্ণুতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতার তালিম নেবার পাঠ শুরু হলো জীবনের পাঠশালায়। আল্লাহ সুবহানুতায়াল্লা স্বামী-স্ত্রী দু’জনকেই দু’ভাবে কঠিন রিয়াজতে লাগিয়ে দিলেন যেন। মন্জিলের বহির্ভাগে ‘শাহানশাহ্ বাবাজান’। অন্তর্ভাগে ‘আম্মাজান’।

জাহেরী-বাতেনী উভয় সড়কে দীপ্তিমান পথিক, মহান পুরুষ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সুবিন্যস্ত হিসাব অনুযায়ী ১৩৮০ বঙ্গাব্দের (১৯৭৩ ইং) ৩০ আষাঢ় শাহানশাহ্ হুজুরকে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ‘বাগান বাড়ী তথা হাসান বাগে’ পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিজেদের সাংসারিক প্রতিকূলতা জয় করার জন্য সংগ্রামের ভার যেন তাঁদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়! শাহানশাহ্ হুজুর ‘মগলুবুল হাল’ মানব। ঘরের দিক সামলানোর দায়িত্ব পড়ে আম্মাজানের উপর। অর্থ-কড়ি সংসার জীবনের গাড়ির চাকা। সে অর্থ কোথায়? আম্মাজান নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির হিস্যা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রথমে ছোট একটা পাকা ঘর নির্মাণ করেন এবং দুই মেয়ে ও একমাত্র শিশুপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে স্বাভাবিক আবাসের অনুপযোগী সেই ঘরে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে ‘গাউসিয়া হক মন্জিলের’ কঠিন যাত্রা শুরু হয় আম্মাজানের ধৈর্যধর স্নেহশীতল আঁচল তলে, একান্ত নিজস্ব

সম্বল ও সামর্থের ওপর ভর করে।

এই বিস্ময়কর তথ্যাদি ‘শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)’ গ্রন্থে সংক্ষেপে পরিবেশন করেছেন এই মন্জিলের সাথে পূর্বাপর সম্পৃক্ত ফানা-ফি-শায়খ মুরীদ লেখক জামাল আহমদ সিকদার : “দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী নিজেকে মনে-প্রাণে স্বামী সেবায় নিয়োজিত করেন। বেদনার্ত মুহূর্তগুলো স্নেহময়ী শাশুড়ি গভীর মমতায় ভুলিয়ে দিতেন। শ্বশুরের কাছ থেকেও পেয়েছেন অত্যধিক স্নেহ। স্বামী জজব হালে...। আবার শান্ত অবস্থায় সুমধুর ব্যবহার।... কষ্টকর কোন কাজ করতে এবং রান্না ঘরে যেতে নিষেধ করতেন।... কখনো চা চাইলেন তো সারারাত চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিকে খেয়ালই নেই। চোখে-ঘুম নামলে কতো অসতর্ক মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন। স্বামীর খেয়াল হলে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদা তাঁকে মূল ভবনে থাকতে নিষেধ করে পেছনের সঁাতসেঁতে নড়বড়ে বেড়ার ঘরে থাকতে বলেন। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা বলে সেবিকা মেয়েরাও সে ঘরে থাকে না। তবুও স্বামীর নির্দেশ পালন করেন। দু’ বছর পর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা পেলে অনুমতি নিয়ে সেখানেই একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেন। মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সে ভবনে থাকেন। শত দুঃখ-কষ্ট এভাবেই আশীর্বাদে পরিণত হয়। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে এমনি অসংখ্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে।”

গাউসিয়া হক মন্জিলে ভেতর-বাইরের সব রান্না হয় এক ডেকচিতে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সন্তান মন্জিলে যে খাবার গ্রহণ করেন, এই লক্ষ ভক্ত সন্তানদের ‘আম্মাজানও’ খান সে খাবার। কোন ফারাক নেই। এই হচ্ছে গাউসিয়া হক মন্জিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের জীবনের সামান্য স্কেচ।

আম্মাজান এই পৃথিবী ছেড়ে মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে গেছেন ০৬-অক্টোবর ২০২১ ইং। এই করোনাকালীন সময়েও তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছিলেন অগণিত শোকাতুর মানুষ। আল্লাহ্ তাঁর রাফ’ই দারা’জাত দান করুন এবং শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পাশাপাশি তাঁকেও আমাদের নাজাত ও কল্যাণের উসিলা করুন। আমিন!

হযরত রাবেয়া বসরী’র (রহ.) বর্ণনায় তওবা

তাসাওউফ জগতে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) হলেন মধ্য-গগণের উজ্জ্বল ভাস্কর সমতুল্য। তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের তাপস সম্রাজ্ঞী। ধর্মভীরুতায়, সততায়, পবিত্রতায়, সতীত্ব ও সাধ্বীতায়, সর্বোপরি আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত এবং নির্ভরশীলতায় তিনি ছিলেন জগতের বুকে হযরত মরিয়ম (আ.)’র উপমা।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) প্রায়শঃ কেবল কান্নাকাটি করতেন। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, “পরম প্রেমাম্পদ মহা-মহান আল্লাহ্‌তায়াল্লা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে কাঁদি।” তওবা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেবল বহিরেন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। কারণ কর্তব্য তো শ্রোতা, পদদ্বয় হচ্ছে চালক মাত্র। আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক কেবল অন্তঃকরণের অতি গভীরে, যেখানে অন্য কিছুই প্রবেশ-অনুপ্রবেশ কখনো কাম্য নয়। তওবা অন্তঃকরণের গভীর অবস্থান থেকে করে কার্য সম্পাদন করতে হয়। তাঁর মতে শুধু মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা মিথ্যাবাদীর কাজ। তওবা কেবল নিজে নিজেই করা যথেষ্ট। অন্যের মাধ্যমে তওবা করার প্রয়োজন নেই। যে প্রকৃত তওবা করে, তার দ্বিতীয়বার তওবার দরকার নেই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, পাপী লোক আল্লাহ্র দরবারে তওবা করলে তা কবুল হয় কি না? জবাবে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলেন, “স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাকে তওবা করার তাওফিক দেন বলেই তো সে তওবা করে। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তাওফিক ছাড়া কেউ তওবা করতে পারে না। আর আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তাওফিক বলে তওবা করায় তওবা কবুল না করার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না।”

তওবা সম্পর্কে তাসাওউফ দৃষ্টির আলোকে তাপস সম্রাজ্ঞী হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)’র ফিক্‌হ ফয়সালা হচ্ছে এরূপ বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তি নির্ভর।

মহান ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২১
 বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
 সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৯৩তম খোশরোজ
 শরিফে রাহবারে আলম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
 সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র
 আশিষ বাণী

নাহমাদুহ্ ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিলিহিল কারিম, আন্মা বাদ।
 আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজিম। বিস্মিল্লাহির
 রাহমানির রাহিম। ফায়কুরুনী আয়কুরুকুম ওয়াশুকুরুলী
 ওয়ালা তাকফুরুন। সাদাকাল্লাহুল মাওলানালা আজিম, ওয়া
 সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল কারিম। ওয়া নাহনু আলা জালিকা
 মিনাশ্ শাহিদিনা ওয়াশ্ শাকিরিন। মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া
 সাল্লিম দায়িমান আবাদা আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি
 কুল্লিহিমিন।

মহান ১০ই পৌষ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল
 হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার বরকতময় খোশরোজ শরিফ
 আজ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের জমিনে মহা-সমারোহে
 উদ্যাপিত হয়েছে। এই পবিত্র সমাবেশের, পবিত্র জমায়েতের
 উপস্থিত আশেকানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, আশেকানে
 মোস্তফা (দ.), আশেকানে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী-
 আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'য়ালার আলিশান দরবারে অগণিত
 শোকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে
 আজ এই পবিত্র খোশরোজ শরিফে উপস্থিত থাকার তৌফিক
 দিয়েছেন। এই আয়োজনে शामिल থাকার সুযোগ করে
 দিয়েছেন তার জন্যে পরম করুণাময়ের দরবারে অগণিত
 শোকরিয়া আদায় করছি। আজকের দিনটির জন্যে আমরা
 সৌভাগ্যবান। আমরা একই সাথে আজকে তিনটি মহা
 গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যকে এক সাথে পেয়েছি। সকল ঈদের সেরা
 ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) আজকে আমরা উদ্যাপন করেছি।
 আজকে একই দিনে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোশরোজ শরিফ
 ২৫ ডিসেম্বর। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
 সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার খোশরোজ
 শরিফও আজকে। ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)ও মূলত খোশরোজ
 শরিফ। এটি একটি খোশরোজ শরিফ অর্থাৎ জন্ম দিবস।
 তিনটি মহা পবিত্র জন্ম দিবস। একটি পবিত্রতম ঈদে
 মিলাদুন্নবী (দ.)-এর সাথে আরও একজন মহান নবীর জন্ম

দিবস এবং একজন মহান অলির জন্মদিবস – তিনটি নেয়ামত
 পূর্ণ উপলক্ষ্যকে একসাথে পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত
 সৌভাগ্যবান। এ উপলক্ষে আমরা নিজেদেরকে নিবেদন
 করেছি। আমরা আজকের দিনে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্মকে
 উপেক্ষা করে নিজেদের সময়কে দরবারে পাকে হাজিরির
 ভেতর দিয়ে কিছু পুণ্য কর্ম, পুণ্য চিন্তার, পুণ্য সমাবেশের
 ভেতর দিয়ে সময়কে অতিবাহিত করে কিছু কল্যাণ হাসিল
 করার যে সুযোগ নিতে পেরেছি এবং তার জন্য আজকে ছুটির
 দিন অনেকে হয়তো পারিবারিক কিংবা সামাজিক কর্মসূচিকেও
 আমরা উপেক্ষা করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি, অর্থাৎ হয়তো বা
 সন্তানদের আবদার ছিল আজকে কোথাও বেড়াতে যাবে বা
 আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যাবে – সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করে
 প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে
 অন্তরে ধারণ করে, মুরশিদের গোলামীর হক আদায়ের লক্ষ্যে
 গাউসুল আযমের দরবারে আজকের দিনটি আমরা সকলে
 কোরবানী করেছি, আজকের দিনটি নিবেদন করেছি, উৎসর্গ
 করেছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই কোরবানীকে
 কবুল করুন।

আমাদের আজকের দিনের এই আসা-বসা সমস্ত যে পুণ্য
 কর্ম-পুণ্য চিন্তায় নিবেদিত থাকার যে প্রয়াস-যে চেষ্টা, এই
 চেষ্টাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নিন। আমরা ঈদে
 মিলাদুন্নবী (দ.)-এর উপরে আলোচনা শুনেছি। আহলে বাইতে
 রাসূল (দ.)-এর উপরে আমরা আলোচনা শুনেছি, হয়তো
 হযরত ঈসা (আ.)-এর উপরে কিছু আলোচনা যদি আসত
 তাহলে বিষয়টা আরও প্রাসঙ্গিক হতো, গুরুত্বপূর্ণ হতো বলে
 আমার মনে হয়েছে। সামনে হয়তো আয়োজকবৃন্দ সেটি
 করবেন, কেননা আমরা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর
 তুরিকার যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা'র মধ্যে
 দেখেছি যে, তুরিকতপছীদের মধ্যে একটি মশরবকে উনি ভাগ
 করেছেন সেটি হচ্ছে নবীদের মধ্যে এবং অলিদের মধ্যেও
 একটি মশরব অর্থাৎ একটি ধারাকে উনি আলাদা করেছেন

সেটিই যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর মশরব হিসেবে উনার চলনভঙ্গি হিসেবে উনার ধারা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। যেহেতু আমরা আজকে একটি দিক পেয়েছিলাম আমরা হয়তো হযরত ঈসা (আ.)-এর কিছু আলোচনা করলে জিনিসটা আরও গুরুত্ব পেত। অনেকের হয়তো মনে হবে যে এটি খ্রিস্টানদের বড়দিন। আমরা কেন করব? কিন্তু আসলে হযরত ঈসা (আ.) তো আমাদের। যেহেতু আমাদের, তাই এই দিনটি পালন করা দুই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত যেহেতু এটি খোশরোজ শরিফ, আমাদের ইসলাম ধর্মে এটির বৈধতা আছে এবং আমাদের একজন নবী, তাই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের উচিত। দ্বিতীয়ত খোদা তা'য়ালার সাথে যে গভীর-নিবিড় ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক সেটির একটি অত্যন্ত মহত্তম যে প্রকাশ তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর চলনভঙ্গিতে, উনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় তাসাওউফপন্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি- এটি নিয়ে যদিও বিভিন্ন মত আছে। আমি দেখেছি যে বর্তমানের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. তাহের উল কাদেরী এটিকে সমর্থন করেছেন এবং আমারও মনে হয়েছে যে, উনার চিন্তাটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, ধর্মসম্মত। হয়তো বর্তমান প্রচলনের সাথে আমাদের মন-মানসিকতার সাথে সেটি যায় না। কিন্তু আমাদের তো বিশাল চিন্তা করতে হবে। শুধু শিরিক, বেদআত কিংবা উরস নেই-খোশরোজ নেই বা অন্য ধর্ম কি করেছে সেটি আমরা কেন করব - এ ধরনের কথা বলে আমরা অনেক কল্যাণ হতে বঞ্চিত হই। অথচ রাসূলে আকরাম (দ.) যখন মদিনা শরিফে আসলেন তখন ইহুদীরা রোজা রাখত। হুজুর (দ.) জিজ্ঞেস করলেন- উনারা কেন রোজা রাখেন? উনাকে বলা হলো যে, ইহুদীরা এদিনকে পবিত্র ভেবে রাখে এজন্য যে এইদিন তারা হযরত মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করেন। সে জন্য তারা এই দিনটিকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে পালন করেন। রাসূল করিম (দ.) ও কিন্তু আশুরার রোজা (প্রিয়নবী বলেন যে, হযরত মুসা আ.-এর উপর তো আমাদের অধিকার বেশি) নিজেও রাখলেন এবং আমাদেরও নির্দেশ দিলেন। একইভাবে সেই ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ অন্য ধর্ম কি করেছে সেটি নয় আমাদের উসুল অনুযায়ী আমরা সেটি করতেই পারি। সেখানে আমরা আরেকজনের আক্বিদা-বিশ্বাসের সাথে তো যাচ্ছি না। আমাদের আক্বিদা-বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমরা সেটি করতে পারি। এজন্যই আমার কাছে মনে হয়েছে আপনারা আসলে সামনের জন্যে চিন্তা করতে পারেন। এদিনটি যেহেতু বারবার আসবে ২৫ ডিসেম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মদিবস। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনী আলোচনায় আনলে হয়তো আলোচনা আরও গুরুত্ববহ হবে।

আজকের এই খোশরোজ শরিফ আমরা আয়োজন করেছি, এটি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্যে এবং অত্যন্ত হৃদয় বিদারক যে প্রথমবারের মতো উম্মুল আশেকিন মা মুনাওয়ারা বেগমকে ছাড়া আমরা প্রথম একটি অনুষ্ঠান করছি। এই অনুষ্ঠান আমাদের করতে হচ্ছে। আমরা ফরিয়াদ রাখছি উম্মুল আশেকিনের রুহানী ছায়া সর্ব অবস্থায় আমাদের মাঝে জারি থাকুক। বিশেষ করে যে মহামারী বিশ্বকে আক্রান্ত করেছে এই মহামারীর ভেতর দিয়ে আমরা এখনো চলছি। আমাদের অনেক আপনজন, অনেক পরিচিত, অনেক দরবারের আশেক ভক্ত এই রোগে দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দোয়াতে স্মরণ করব ইনশাআল্লাহ। অগণিত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, অর্থ সংকটে পড়েছেন, কঠিন একটি সময় পার করে এসেছেন, এখনো পার করছেন। সামনের সময়টি যাতে সকলের জন্যে সহজতর হয় এ ধরনের কঠিন পরীক্ষা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে যাতে রক্ষা করেন, উদ্ধার করেন - আমরা যাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি তার জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করছি।

খোশরোজ শরিফ, উরস শরিফ, এগুলো আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিম হিসেবে একজন মু'মিন মুসলিম হিসেবে। আমাদের জীবনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যেই- একজন শায়ের বলেছিলেন, 'মুহাব্বত নে জুলমত ছে কাড়া হ্যায় নূর মুহাব্বাত না হুতি, না হুতি জাহুর। অর্থাৎ, মুহাব্বাত সেই বস্তু যে বস্তু জুলমত থেকে নূরকে কেড়ে এনেছেন, যদি মুহাব্বাত না থাকত তাহলে এই জহুর অর্থাৎ এই বিকাশই হতো না। এটি শায়ের বলেছেন হাদিস শরিফ থেকে- 'কুন্তু কান্জান মাখফিইয়ান। ফা আহবাবতু আন উরাফা... অর্থাৎ, আমি ভালোবাসলাম যে, আমি পরিচিত হব, আল্লাহ রাব্বুল "আলামিন আল্লাহুস সামাদ" - অমুখাপেক্ষী। কিন্তু উনার কুদরত থেকে উনি ইচ্ছা করলেন, উনি ভালোবাসলেন যে উনি পরিচিত হবেন, উনি সৃষ্টি করলেন। কোরআনুল করিমে সেটি আমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেয়া হলো- বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম- 'কুল ইন কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়ুনী'। যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ সম্পর্কটা ভালোবাসার। আনুগত্যের মাধ্যমে ভালোবাসার একটি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এটিই হচ্ছে সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই ভালোবাসার বাণীটিই আবার প্রকাশিত হলো, হাদিস শরিফে এসেছে- রাসূল (দ.) বলেছেন যে, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে অর্থাৎ নবী করিম (দ.) কে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মা-বাবা এমনকি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি

ভালোবাসবে। অর্থাৎ এটি হচ্ছে ভালোবাসার সম্পর্ক। এখন আমরা আত্মকা বা তাকওয়াকে ভয়ের সাথে সম্পর্কিত করে ভালোবাসার সম্পর্কটিকে এক ধরনের দূরে ঠেলে দিয়েছি, বিনষ্ট করে ফেলেছি। আউলিয়ায়ে কেরাম সেটিকে আবার কাছে টেনে এনেছেন। মুর্শিদকে ভালোবাসার মাধ্যমে পিয়ারা রাসূলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। পিয়ারা রাসূলকে গভীরতম ভালোবাসার ভেতর দিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। এইভাবে আশেক ভক্তকুলকে সিরাতুল মোস্তাকিমের উপরে রেখেছেন। তারই জন্যে মাওলানা রুমি একটি মাজহাবের নাম দিয়েছেন “মাজহাবে ইশ্ক”। উনি বলেছিলেন যে, প্রেমিকগণের মাজহাব আলাদা। তাদের একটি আলাদা রাস্তা আছে, আলাদা পথ আছে। মাজহাব অর্থ যদি ফিকহ্ বুঝায় তাদের জন্য আলাদা একটা ফিকহ্ আছে। আমার কথাগুলো হয়তো অনেকে ভুল বুঝতে পারেন, এগুলো আমার অনুভূতি থেকে বলছি। আমি কোন ফতওয়া দিচ্ছি না। আমি কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না। আমার অনুভূতিগুলো বলছি।

বিশ্বালি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী কেমন অলি ছিলেন? বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা সেই দরজার অলি ছিলেন— যাঁর জন্মের পর পবিত্র নাম মোবারক হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা কাবা কর্তৃক নির্ধারিত হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। আপনারা জানেন উনার নাম রাখা হয়েছিল সৈয়দ বদিউর রহমান। এটি তাঁর পিতা রেখেছিলেন। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নে নির্দেশ দিয়ে সেই নাম মোবারক পরিবর্তন করে ‘সৈয়দ জিয়াউল হক’ রেখেছিলেন। অর্থাৎ সৈয়দ জিয়াউল হকের জন্যে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খজিনায় যে বরাদ্দটুকু ছিল সেটি যেন শুরু থেকেই প্রদান করা শুরু হয়ে যায়। শিশু অসুস্থ হয়ে গেলেন : মৃত প্রায়, জীবন আছে কি নেই বুঝা যাচ্ছে না। মহান নানা জান গাউসুল আযম বিল বিরাসাত কুতুবুল আকতাব শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার কদমে নিয়ে যাওয়া হল। গাউসুল আযম বিল বিরাসাত কুতুবুল আকতাব শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান কেবলা কাবা তাঁর হাত মোবারক থেকে দুই ফোঁটা পানি মোবারক তাবাররুক হিসেবে নাতির মুখের মধ্যে দিলেন; মৃত প্রায় নাতি চোখ মেলে তাকাল। এর মাধ্যমে যেন বাবা ভাণ্ডারী কেবলায় আলমের যে তরকা পাওনা সৈয়দ জিয়াউল হকের ছিল, বাবা ভাণ্ডারী যেন তারই সেই দান শিশুকাল থেকে তাঁকে প্রদান করা শুরু করলেন। এ দুটো ঘটনা কিছ্র ইউনিক। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং বাবা ভাণ্ডারী কেবলায় আলমের বেলায়তের যে সামিয়ানা, অগণিত আল্লাহ্‌র অলি সেই সামিনয়ার তলে আছেন।

প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মহৎ মহৎ জীবন কাহিনী আছে। তাঁদের শুরু, তাঁদের বিকাশ এগুলো অনেক চমৎকার ইতিহাস। কিছ্র এর মধ্যে এই ঘটনাগুলো ইউনিক। এগুলো অন্য কোন অলির সাথে পাওয়া যাবে না।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর যখন রিয়াজতের জীবন শুরু হল সবাই উদ্ভিগ্ন হন, পিতা উদ্ভিগ্ন চিন্তিত। পরিবারের সবাই উদ্ভিগ্ন, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী জানালেন যে “আমি জিয়াউল হককে তোমাদের জন্যে বাতি জালাচ্ছি। চেরাগ জালাচ্ছি।” অর্থাৎ অনেক লকুবের মধ্যে শাহানশাহ্ বাবাজানের একটি লকুব “চেরাগে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী” উলামায়ে কেরাম হাদিস শরিফটি বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কাউকে ভালোবাসেন তার নাম প্রকাশিত হোক সেটি চান। তার নাম প্রথমে আকাশে ছড়িয়ে যায়। ফেরেশ্তারা সেটি আলোচনা করতে থাকে এবং ওখান থেকে নিচে নেমে আরো মানুষের মুখে মুখে তা প্রকাশিত হয়, প্রচারিত হয়। ইমাম শেরে বাংলা (র.) উনার ‘দিওয়ানে আজিজ’ কিতাবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে বলেছেন, “আঁ চেরাগে উম্মাতানে আহমদী” অর্থাৎ উম্মাতে আহমদীর চেরাগ। আমি অভূতপূর্ব মিল যেটি সেটি দেখাচ্ছি। শাহানশাহ্ বাবাজানের জন্যে যে চেরাগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে খোদায়ী নির্দেশে ইমাম শেরে বাংলা একইভাবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্যে একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মানে এই নয় যে, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হয়ে গিয়েছেন। এর দ্বারা এটিই বুঝা গেল যে, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে নিজের ভেতরে কি পরম মমতায়, আদরে, স্নেহে, ভালোবাসায় নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছেন সেটিই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে। এই চেরাগ অভিধা, এই লকুবটি কিছ্র আর কোন অলির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাইনা। এটি ইউনিক একটি ফিচার। এই মিশে যাওয়াটি বুঝতে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন যে, “জিয়াউল হক আমিই”। গুরুত্বপূর্ণ একটি সন্ধিক্ষণে প্রতিনিধিত্ব কিংবা মর্যাদায় বরণ করে নেওয়ার জন্যে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলায় আলমকে উনার নিজের যে খিরকাহ্— সেই খিরকাহ্ পরিণে বরণ করে নিয়েছেন। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় – যখন আমরা দেখি অছিয়ে গাউসুল আযম শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে সেই চৌগা, সেই খিরকাহ্ জড়িয়েই তাঁকে উত্তরাধিকারীত্বে বরণ করে নেন। শুধু তাই নয়, তারও আগে আরও একবার সেই খিরকাহ্‌র সাথে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা

কাবার একটি সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, শাহানশাহ বাবাজান যখন অত্যন্ত বিচলিত হালের কারণে অস্থির অবস্থায় আছেন, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী অছিয়ে গাউসুল আযমকে নির্দেশনা দিলেন যে, “আমার চাদর, আমার কবা, আমার খিরকাহুটি জিয়াউল হককে পরিয়ে দিন।” এই ঘটনাটি হযরতের জীবনী শরিফে আছে। এগুলো সবগুলোই আমি জীবনী শরিফ থেকে বলছি। এগুলো একটিও আমার নিজস্ব কথা নয়। পিতা তাই করলেন, হযরত কেবলমতে আলমের চৌগা মোবারক এনে উনি পরিয়ে দিলেন শাহানশাহ বাবাজানকে এবং সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেলেন, অস্থিরতা দূরীভূত হয়ে গেল। অর্থাৎ উনার অন্তর যেন এটির প্রতীক্ষা করছিল। সেই চৌগা যখন জড়িয়ে দেওয়া হল উনি শান্ত হয়ে গেলেন, সেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, উনি প্রশান্ত হয়ে গেলেন, উনার অস্থিরতা দূরীভূত হয়ে গেল এবং দীর্ঘদিনের নির্ঘুম অবস্থা শেষে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এই যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর চৌগার সাথে, খিরকাহুর সাথে শাহানশাহ বাবাজানের যে নিবিড় সম্পর্ক সেই একই সম্পর্ক আমরা দেখেছি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী যখন বাবা ভাণ্ডারী কেবলমতে আলমকে সেই চৌগাটি পরিয়ে দেন। এটিও একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা, যেটি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে মাইজভাণ্ডারী অঙ্গনে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবেই শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে মহান অলি হিসেবে বিশ্বের জন্যে, আমাদের জন্যে, মজলুমের জন্যে, বঞ্চিতের জন্যে হতাশাগ্রস্ত জনগণের জন্যে, দুঃখী জনগণের জন্যে, অপরাধী জনগণের জন্যে রহমত হিসেবে দিয়েছেন। আমরা সেই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার জন্যে এই মহান ১০ পৌষে সমবেত হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্যেই আমরা আজকে সমবেত হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই সমাবেশকে কবুল করে নিন।

আপনারা শাহানশাহ বাবাজানের আশেক-ভক্তগণ মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি গড়ে তুলেছেন নানা জায়গায়। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গোলামেরা নানান জায়গায় তুরিকার খাদেম হিসেবে তুরিকার আদর্শকে দিকে দিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সাংগঠনিকভাবে সমাজকে এই শিক্ষার সাথে, আদর্শের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত কিভাবে করা যায় এবং নিজেরাও যাতে অত্যন্ত গুছিয়ে তুরিকার সাংগঠনিক কর্মপন্থা পরিচালনা করা যায় তার জন্যে আপনারা জায়গায় জায়গায় সংগঠন করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আপনারা করছেন আলহামদুলিল্লাহ। দরবারে পাকের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক, যে নিসবত সেটি প্রথমত ব্যক্তিগত,

একেবারে ব্যক্তিগত। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে, পারিবারিক জীবনকে, সামাজিক জীবনকে কেমন করে আমি কল্যাণময়তা দিয়ে পূর্ণ করে দিব তার জন্যে চেষ্টা করা, নিজেকে কল্যাণময়তায় পূর্ণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত রাখা-নিবেদিত রাখা, পরিবারকে, সমাজকে নিজ ব্যক্তিগত জায়গা থেকে - এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম দায়িত্ব। দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে আরও ন্যায়পূর্ণভাবে আরও সুশৃঙ্খলভাবে সমাজ যাতে পরিচালিত হতে পারে তার জন্যে যৌথভাবে যাতে সকল আশেক-ভক্ত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার এক ধরনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের কিছু কর্ম প্রচেষ্টা, কর্ম প্রয়াস দিয়ে সমাজ থেকে কিছু কিছু অন্যায়-অবিচার ভুল-ভ্রান্তি দূরীভূত করার জন্যে, কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করার জন্যে কিছু অভাব-অভিযোগ, কিছু দুর্বলতা দূর করার জন্যে সামষ্টিকভাবে খেদমতের আঞ্জাম দেওয়া। এটি হচ্ছে সমষ্টিগত একটি প্রয়াস, সমষ্টিগত দায়িত্ব যেটি মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটিরই দায়িত্ব। আলহামদুলিল্লাহ, এই দুটি কাজ আপনারা করে চলেছেন গুরুত্বের সাথে। কিছু কিছু দিকে হয়তো আমাদের আরও বেশি নজর দিতে হবে। সমস্ত কর্মসূচির হিসাব-নিকাশ স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সাথে যাতে করা হয়, তরুণেরা যাতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে তার জন্যে হাতে-কলমে তাদের কাজ শিখিয়ে দিতে হবে। এমনকি দরবারে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন বিধিগুলো বেধে দেওয়া হয়, তার ভেতরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ধরুন, আপনি বললেন যে- একশ জনের জন্যে টোকেন প্রয়োজন। আপনারাতো জানেন যে এখন কোন কমিটি থেকে কতজন আসবে সেটা আগে থেকে একটি ধারণা পাওয়ার জন্যে আপনারাদের থেকে টোকেনের চাহিদাপত্র নেওয়া হয়। যাতে ব্যবস্থাপনার দিক হতে কোন অসুবিধা না হয় তার সুবিধার্থে। যদি আমরা একশ জনের টোকেনের কথা বলি, একশ জনের চাহিদাপত্র দিই তাহলে যাতে একশ জনই আসা হয়। কথাটি এজন্যই বলছি, যদি কোন কারণে (কারণটা যত মহৎই হোক না কেন) এটি যদি এন্তেজামের উপর চাপ হয়ে যায়, অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু এই উরস মোবারকের যে সাবলীল সৌন্দর্য সে সাবলীল সৌন্দর্য অনেক সময় বিনষ্ট হতে দেখেছি আমরা নানানভাবে। এজন্যে যে সময়ে আসার কথা সেই সময়ে আসতে হবে, যে রিপোর্ট করার কথা সেই রিপোর্ট করতে হবে যেইভাবে যেই বিধি-বিধান বেধে দেওয়া হয়েছে তার ভেতরে থাকার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, কাজ করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, সেইভাবেই সাজিয়ে নিতে হবে সবকিছু। শুধু এইখানে নয়, নিজের এলাকায়ও আপনারা যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেবেন সেখানেও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা যাতে গড়ে উঠে। তুরিকতের একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি যাতে

সকলের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, সেভাবে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটিকে তৈরি করে নিতে হবে ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকেও। আপনাদের ডেডিকেশন, নিবেদন সীমাহীন। সেদিক থেকে সেটি প্রশংসনীয়। কিন্তু সাংগঠনিক এই যে কথাগুলো বলছি— নিজেদেরকে আরও গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আপনাদের মনযোগী হতে হবে।

সেটি আপনাদেরকে অনেক সময় বলা হয় বা অনেক সময় বলা হয় না। নিজেদের সেটি চিন্তা করে ঠিক করে নিতে হবে। নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান যেটা বেঁধে দেওয়া হয় তার ভেতরেই যাতে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে গুছিয়ে নিতে পারি তার জন্য সচেতন থাকতে হবে। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদ সকলে মিলে দরবারে পাকের যে দয়া, যে শিক্ষা, যে আদর্শ, যে দায়িত্ব, যে কর্তব্য আমাদের উপরে আছে সেটি সমাজে যাতে আমরা স্থাপন করতে পারি নানানভাবে তার জন্যে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদ এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নানান কর্মসূচি নিচ্ছে সেগুলোতে আপনারা নানানভাবে সহযোগিতা করছেন, সফলতায় অবদান রাখছেন। আপনারা নানাভাবে এই খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ্ এটি সমাজে যথেষ্ট গৃহীত হয়েছে, আপনাদের এই চেষ্টাগুলোকে সকলে সম্মানের চোখে দেখছে। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর তুরিকার খাদেম হিসেবে আমরা এগুলো করছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এই খেদমতগুলো আরও ব্যাপকভাবে করার জন্যে আমাদের সকলকে জানে-মালে তৌফিক আত্মা করুন।

আরও কিছু বিষয় আমার আলোচনার ইচ্ছা ছিল। উম্মাহ্ কেন্দ্রিক কিছু আলোচনা আমি ইনিশিয়েট করতে চাইছি। কিন্তু মনে হচ্ছে আজকে সেটি আমি করবনা। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, ইসলাম অর্থ হচ্ছে শান্তি। শান্তি অর্থ হচ্ছে Absence of Violence, Absence of Conflict। যেখানে সংঘাত থাকবে, যেখানে Violence থাকবে সেখানে শান্তি হবে না, শান্তি পাওয়া যাবেনা এবং সেখানে ইসলাম আছে সেটিও দাবি করা যাবে না। যদিও ইসলামের নামে সেটি চালিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণ কি? আমরা দেখেছি জিহাদের নামে বর্তমানে যেটি করা হয় তা ইসলামের নামে করা হয়, কিন্তু তার ফলাফল হয় অশান্তি। Conflict সৃষ্টি করা হয়। আমরা অনেক Confusion দেখেছি। আমাদের সমাজে নানান Confusion। প্রথমত এটি Conflict আকারে আসে। আমাদের সমাজে একটি Conflict হয় একজনের সাথে একজনের। আমরা সুন্দর করে সমাজে নানান চিন্তা ধারার মানুষ একসাথে চলছি। কিন্তু দেখা গেল এক শ্রেণির

মানুষ এসে ধর্মের নামে এমনভাবে কিছু উপস্থাপন করল, Conflict তৈরি করল সমাজে এবং ওখান থেকে আস্তে আস্তে সেটা Violence এ পরিণত হলো, সহিংসতায় পর্যবসিত হলো। এটি আমাদের এখানে কম দেখা গেলেও আরব দেশে আমরা বার বার দেখছি। কিন্তু এটি হচ্ছে জিহাদের নামে তথা ইসলামের নামে। এখন আমরা এটির জন্যে কাউকে দায়ী করতে পারি। একটা হতে পারে আমরা একটা গোষ্ঠীকে দায়ী করতে পারি যে, ‘ওরা বুঝে না’, ওরা বিভ্রান্ত, ওরা খারাপ। একভাবে আমরা এর দায়টা আমরা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি। আরেকভাবে বলতে পারি যে “এগুলো বলা হয়”, আরেকভাবে বলতে পারি যে, “এগুলো কারো চক্রান্ত”। কোন একটা গোষ্ঠীর চক্রান্ত – Conspiracy। এটাকে বলা হয় Conspiracy থিওরি, এটা চক্রান্ত। অথবা “আমরা তো এ রকম না”। আসলেই তো মুসলিমরা সংঘাত প্রিয় না, সন্ত্রাস প্রিয় না, সহিংসতা প্রিয় না। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এগুলো হচ্ছে। যখন হচ্ছে তখন এটাকে আমরা কোন একটা গোষ্ঠীর দিকে দিয়ে দিই অথবা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাইরের চক্রান্ত হিসেবে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। এটি কোন সিদ্ধান্তও নয়, এটি আমার কোন বিশ্বাসের জায়গাও নয়। এটাকে বলা হয় Thought experiment। এটা অনেক বিষয়ে এখন আমাদের করা দরকার। অর্থাৎ এটা করলে কেমন হয়, এটা কেমন, ওটা কেমন। এটা কেন হচ্ছে? এটা এই যুক্তিতে করা হচ্ছে যে “জিহাদ করাতো ফরজ”। যেহেতু জিহাদ করাতো ফরজ, কাজে কাজেই এই যুক্তিতেই এটি করা হচ্ছে। যদিও জিহাদ বলা হচ্ছে কিন্তু ফলাফল সহিংসতা, সন্ত্রাস, সংঘাত এবং শেষ পর্যন্ত সেটি উম্মাহুর বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইসলামের দাওয়াত যেখানে বাধা পায়, সেখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ ফরয। কিন্তু আমি যেটা ভাবছিলাম, যে বর্তমানে বিশ্বে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে কালেমা পড়তে বাধা দেওয়া হয়, নামায আদায় করতে বাধা দেওয়া হয়, রোযা রাখতে বাধা দেওয়া হয়, হজ্জ করতে বাধা দেওয়া হয়, যাকাত দিতে বাধা দেওয়া হয়, এমনকি ইসলামের দাওয়াত দিতে বাধা দেওয়া হয়। আপনি Western Country বলেন কিংবা সমগ্র দেশেই ইন জেনারেল আমরা বলতে পারি যে, ৯০ ভাগ বিশ্বে ইসলাম ধর্মের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন এবং সামাজিক আচার-আচরণ, এমনকি দ্বীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়না। তো সে ক্ষেত্রে আমরা এভাবে এই জিহাদের অর্থাৎ জিহাদে আসগর তথা ক্বিতাল – সশস্ত্র জিহাদের আসলে প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট আছে কিনা সেটি আমি মনে করি আমাদের মুরুব্বীগণ যাঁরা ধর্মবেত্তা আছেন তাঁদের ভেবে দেখা

দরকার। আর এটি যদি এই মুহুর্তে কার্যকরী না থাকে তাহলে সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া দরকার আছে কিনা যে, এখন সশস্ত্র জিহাদের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সব জায়গায় ইসলাম ধর্ম পালন এবং দাওয়াতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না। কিছু কিছু রাজনৈতিক গোলযোগের কথা (আমরা শুনি)। এগুলো রাজনৈতিক গোলযোগ। যদি আমেরিকার কথা বলি, আমেরিকার রাস্তায় কিংবা যে কোনখানে নামায পড়তে কোন বাধা নেই, হজ্জ করতে কোন বাধা নেই। ইউরোপে বলি - একই অবস্থা। এখন আমি তো মুসলিম দেশের মত কিংবা চট্টগ্রামের মত কিংবা মক্কা মদিনার মত সেই রকম অবস্থা অমুসলিম প্রধান দেশে পাব না। কিন্তু প্রধানত কোন বাধা আমরা এই পর্যন্ত দেখতে পাইনি। অনেক দিন থেকেই এই অবস্থা নেই। সেই ক্ষেত্রে আসলে সুফিয়ায়ে কেলাম যেটি বলেছেন যে, “এখন হচ্ছে জিহাদে আকবরের সময়”। অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়। উনারা অনেক আগেই এই শিফট, এই চেইঞ্জটি করেছেন। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক মহল, যারা ধর্মীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত তারা মনে করেন যে এখনো এই কিতাল কিংবা এই সশস্ত্র জিহাদ এখনো প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সব জায়গায় নামায পড়তে, হজ্জ করতে, রোযা রাখতে কোথাও বাধা দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি করে থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি দেশও আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেখানে এভাবে বাধা প্রদান করা হয়। সেই ক্ষেত্রে আসলে এটি প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে সেটিকে ... যেমন উহাদরণ বলছি, এটি কিভাবে করা হয়? আপনাদের গুনতে হয়তো একটু অস্বস্তি লাগছে আমি জানি। আমাদের যাকাতের খাত হচ্ছে ৮টি। এর একটি খাত হচ্ছে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব। অর্থাৎ সেই সমস্ত অমুসলিম যাদের কুলবে উলফাত আছে, ইসলামের প্রতি প্রেম, মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি আছে এই শ্রেণির মানুষকে বলা হয়েছে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব। হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুসারে, রাসূল করিম (দ.)-এর মুয়াল্লাফাতুল কুলুব হিসেবে যাদেরকে যাকাত দিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই অমুসলিম, ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই মুয়াল্লাফাতুল কুলুব খাতটির বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, এখন সবাই মুসলিম হয়ে গেছে। কাজে কাজে এখানে তো আর অমুসলিম নেই, এখন তো সেই শ্রেণির মানুষ আর নেই, এই শ্রেণির মানুষকে এখন আর যাকাতের অন্তর্ভুক্ত করার কোন কারণ নেই। উনি বললেন যে, অন্য ৭টি খাতই জারি থাকবে। যেহেতু এটির গ্রহীতা নেই সেহেতু এই খাতটি স্থগিত হয়ে গেল। সেই থেকে আজকে পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে একটি মত আছে এবং এটি চালু আছে, সেই খাতটি স্থগিত

হয়ে আছে। এটি কিন্তু কোরআনের একটি খাত, কোরআন প্রদত্ত একটি খাত। আজ প্রায় ১৪শত বছর ধরে স্থগিত হয়ে আছে। প্রথম কথা হচ্ছে- বুঝা গেল যে, এটি ছিল হযরত ওমর (রা.) এর একটি ইজতিহাদ। এটি উনার অধিকারে আছে বলে যথোপযুক্ত কারণে উনি এটি করেছেন, এই খাতটি স্থগিত করেছেন। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি যে, এটি উনি অবশ্যই চির জীবনের জন্যে বা একদম সব সময়ের জন্যে স্থগিত করেননি। এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি করেছেন। আমি বলতে চাচ্ছি যে, একইভাবে আসলে বর্তমানে যদি সশস্ত্র জিহাদের বাস্তবতা না থাকে সেক্ষেত্রে সেটি আমরা আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে... যারা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটি আমার মতামত, কোন সিদ্ধান্ত না বা আমার বিশ্বাসের অংশ সেটিও বলছি না। আমি একটি চিন্তার খোরাক দিচ্ছি বলতে পারেন। যে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা আসলে সেটিকে এখন আর প্রয়োজন নেই বা প্রয়োজ্য নয় এই বিষয়টি আসলে বলে দেওয়ার দরকার আছে কিনা? কেন? এটি বলে দেওয়া দরকার আছে এজন্যেই- আপনারা অমুসলিম বিশ্বে একটি শব্দ গুনবেন “ইসলামোফোবিয়া” - ইসলামভীতি। ৮০০ কোটি বা ৭০০ কোটি মানুষের এই দুনিয়াতে আমরা ১৮০ কোটি মুসলিম, বাকি সব অমুসলিম। একটা ফোবিয়া একটা ভীতি ছড়িয়ে গেছে। মুসলিম হচ্ছে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, সহিষ্ণু এবং সন্ত্রাসমুক্ত একটি জাতি। সেই জাতিকে একটি সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে - নাউযুবিল্লাহ্। কেন? আইএস এর কারণে। কেন? নানান কারণে, আমরা সেটি জানি। এখন এই তকমাটি লাগছে কিছু মানুষের কারণে। সেই কিছু মানুষ কেন এটি করছে? তারাও করছে কিন্তু একটা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে। তারা বলছে যে, ‘না এখন সশস্ত্র জিহাদ করতেই হবে। এটি ফরজ’। তারা কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের পরে সশস্ত্র জিহাদকেও ছয় নাম্বার একটি মূল বুনিয়াদ হিসেবে ধরে নেন।

যেই কারণে খুব সহজেই এক শ্রেণির মানুষ বিভ্রান্ত হয়। নানান রাজনৈতিক উস্কানি যখন এর ভেতরে যায় তখন একটি সহিংস সন্ত্রাসী একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। যার কারণে তারা বলে, ‘আমরা জিহাদ করছি’। কিন্তু তারা বিশৃঙ্খলা করছে, সন্ত্রাস করছে, মানুষ হত্যা করছে। মুসলিম উম্মাহ্ও এটি Accept করছে। সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি বলতে চাইছি যে, এখানে ইজতিহাদের প্রয়োগ করার অবকাশ আছে কিনা? ইজতিহাদের কথা যদি আমি নাও বলি, চিন্তা-গবেষণা কিংবা এখানে একটু কিছু কাজ করার দরকার আছে কিনা? তাতে বিশ্বশান্তি ত্বরান্বিত হবে কিনা, বিশ্বে যে সন্দেহ, আমাদের ভেতরে, নিজেদের ভেতরেও... শুধু জিহাদের নামে মাজারে বোমা

মারছে। কেন? মাজারে বোমা কেন মারবে? কারা মারে আমরা জানি। তারা এটিকে জিহাদ মনে করে, সশস্ত্র সংগ্রাম মনে করে। ‘ইসলামের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি বিষয় এজন্যে মাযারে বোমা মারতে হবে, এটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, এটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতে হবে’ – তারা এ ধারণা লালন করে। এই যে ভয়ের একটি আবহ তৈরি করে দিয়েছে তারা এইখানে আমাদের চিন্তা করার অবকাশ আছে কিনা, ভাবার অবকাশ আছে কিনা? কারণ আমরা তো আক্রমণ উদ্যত নই। সশস্ত্র জিহাদ এই মুহূর্তে কার্যকরী বলে কেউ মনে করছে না। তাহলে সেটি যদি আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যায়, প্রকাশিত হয়, ওআইসি যদি বলে কিংবা আরও কোন বড় সংস্থা বলে, তাহলে দেখা যাবে কি যে সন্দেহের অবকাশ বা ভীতির একটি অবকাশ তৈরি হয়েছে সেটি দূর হয়ে যেত। বিভ্রান্ত গোষ্ঠী একটি সুযোগ নেওয়ার যে অপচেষ্টা করছে তারা সেই সুযোগ আর পেত না। মুসলিম সমাজও অনেক শান্তির ভেতর দিয়ে যেত, ইসলাম যে প্রকৃত অর্থে শান্তি সেই শান্তির পরিবেশ আমরা ফেরত পেতাম হয়তো। আমি এটা শুধু একটা চিন্তার কথা বললাম। আপনাদের জন্যে বলিনি। হয়তো অনেকে গুনবেন, আমি তাদের জন্যে বলেছি। আপনাদের জন্যেও, আপনারা যদি চিন্তা করেন। আপনারাও চিন্তা করতে পারেন এই বিষয়ে।

কারণ আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক একশ বছরে একজন মুজাদ্দিদ আসবেন। এটি হচ্ছে ইসলামের একটি ইনবিল্ট মেকানিজম। ইজমা-কিয়াস অর্থাৎ ইজতিহাদ অর্থাৎ নবায়ন, নতুন চিন্তার, নতুন নতুন চিন্তায় একমত হওয়া, নতুন নতুন ইজমা করা, যেগুলো কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে বা হাদিস থেকে সরাসরি ডেরাইভ করা যাচ্ছে না সে ধরনের সিদ্ধান্তগুলো ইজমা-কিয়াসের মাধ্যমে করা এবং স্বাধীন চিন্তা করার যে প্রবণতা একক অথবা যৌথ – কারণ এখন তো আর ইমাম আবু হানিফা আসবেন না। কাজে কাজে একক সেই পাণ্ডিত্য দিয়ে এখন আর আসলে চিন্তা করা যাবে না। যৌথ একটা চিন্তার ভেতর দিয়ে ইজতিহাদের যে সুযোগ যে মেকানিজম, অর্থাৎ নতুন চিন্তা, নতুনভাবে নবায়নের যে একটি প্রয়োজনীয়তা এবং খাতগুলো নবায়নের একটি মেকানিজম ইসলামের ভেতর বিল্টইন করা আছে। প্রত্যেক একশ বছরে একজন মুজাদ্দিদ আসবেন। মুজাদ্দিদ মানে যিনি নবায়ন করবেন, তাজ্জিদ করবেন। ইজতিহাদ মানে হচ্ছে সেটাও নতুন নতুন চিন্তার, নতুন নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন চিন্তা দিয়ে মৌলিক নীতির সাথে ফিকাহকে আপডেট করা। এখন যেটা হচ্ছে, আমরা যেটা দেখি এখানে বলা হয় যে, “এটা

শরীয়তে নেই”। আসলে বলা হয় ফিকাহতে নেই। এটা ফিকাহতে নেই, কিন্তু এটা শরীয়তে নেই এভাবে বলাটা খুবই মুশকিলের কথা। এটা ফিকাহতে নেই। দেখা যাবে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সেটি ফিকাহতেও আছে। কারণ শরীয়ত হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, ফিকাহ হচ্ছে পরিবর্তনীয়। শরীয়ত হচ্ছে উৎস আর ফিকাহ হচ্ছে সেই উৎস থেকে উদ্গত চিন্তা, যেটি কোডিফাইড নলেজ, যেটি আমাদের দৈনন্দিন শৃঙ্খলা বিধানে গণমানুষের জন্যে উপযোগী একটি বিন্যাস। আমরা ক্রমাগতভাবে ইজতিহাদ-ইজমা কিয়াস তাজ্জিদ এটির Systematic যে বিন্যাস এই বিন্যাসটি দেখতে পাই না – বলা হয় ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এটি আমাদের জন্যে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম একটি প্রগতিশীল ধর্ম। পরিবর্তনের সাথে ইজতিহাদ ইসলামের মূলনীতিকে অটুট রেখে, নিখুঁত রেখে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে, নবায়নের মাধ্যমে প্রগতিশীল রাখে সমাজকে – যখন আমরা ইজতিহাদ বন্ধ করে দিয়েছি সাথে সাথে এই রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নানান সামাজিক চিন্তা-ভাবনা গবেষণায় মুসলিম উম্মাহ্ যে পিছিয়েছে তার জন্যে আসলে এগুলো দায়ী কিনা আমার মনে হয় আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ ইসলাম আমাদেরকে চিন্তা করতে শেখায়, গবেষণা করতে শেখায়, অবদান রাখতে শেখায়। মুসলিম হিসেবে আমরা অবদান রাখার কথা, গবেষণা করার কথা, অনেক কিছু করার কথা। অবদান রাখার কথা মানব সভ্যতায় পথ দেখানোর কথা। কিন্তু আমরা দেখছি এটি দিনের আলোর মত সত্য যে, মুসলিম উম্মাহ্কে সব সময় আরেকজনের দেখানো পথেই চলতে হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন? Why? এ রকম কেন হচ্ছে? উত্তর হচ্ছে, আমাদের নিজেদের আপডেট করার জন্যে আপগ্রেড করার জন্যে যে মেকানিজম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেটি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। পারছি না বলেই আজকে উম্মাহ্ এই দুর্বল এবং নিদারুণ একটি পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। এটি একদিনে হয়নি। এটা কয়েকশ বছর ধরে হয়েছে। আমার এই কথাগুলো অবশ্য আজকের খোশরোজ শরিফের আলোচনা না, এটা আমার বিভিন্ন সময় চিন্তায় আসে; আমি ভাবলাম একবার একটু বলেই দিই। কেউ হয়তো আমাকে ভুল বুঝবেন, কেউ হয়তো অপছন্দও করতে পারেন। কিন্তু আমি ভাবলাম এগুলো আমি বলি। চিন্তা করা দরকার, যারা চিন্তা করেন আমার মনে হয়েছে তাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। কারণ একটি চক্র – Circular Position এ আমরা পড়েছি, শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। সামনের দিকে অগ্রসর আর হতে পারছি না।

শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। এ ধরনের একটি পরিস্থিতির মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্ পড়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। এটি আমার সাধারণ মনের সাধারণ চিন্তা। অসাধারণ মনের, অসাধারণ চিন্তার জন্যে আমি বিষয়টা রেখে গেলাম। এটি যে একেবারে আমার নিজের চিন্তা থেকে উদগত হয়েছে তা নয়। বেলায়তে মোত্লাকা আমাকে এভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছে। আমি দেখেছি, বেলায়তে মোত্লাকার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা এ রকম। ওখান থেকে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি বলতে পারেন এই চিন্তা করার জন্যে। কারণ মুসলিম মানে হচ্ছে একজন কাজী, একজন বিচারক। একজন বিচারককে নিরপেক্ষ হতে হবে। সে যখন বিচার করবে তাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। একজন মুসলিমের মন হতে হবে নিরপেক্ষ। এখন আসলে নিরপেক্ষ চিন্তা করতে আমরা পারছি নাকি ভুলে গেছি এটি ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমরাতো বিচার করবো, একজন মুসলিম বিচার করবে। হক-বাতিলের বিচার করবে। এখন হক বাতিলের বিচার যে করবে সে যদি নিরপেক্ষ চিন্তা করতে না পারে তাহলে বাতিল যদি তার দলের হয় তাহলে সে বাতিলকে হক বলে চালিয়ে দিতে পারবে। কারণ তার নিরপেক্ষ চিন্তা করার অভ্যাস নাই, যোগ্যতা নাই, Capacity নাই, সেটা সে জানে না। বাতিলকেও হক বলে চালিয়ে দিবে সে। কারণ বাতিল তার দলের। সে নানানভাবে যুক্তির জাল বিস্তার করে এদিকে ঠেলে দিবে। কিন্তু ইসলামের দাবী হচ্ছে, তুমি তোমার নিজের বিরুদ্ধে গেলেও যা সত্য, যা বিবেকে সত্য বলছে সেটিই তোমাকে মেনে নিতে হবে, নিজের বিরুদ্ধে গেলেও। সেই নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা আমাদের আত্মস্থ আছে কিনা, চিন্তা-চেতনার মধ্যে আছে কিনা এটিও আমাদের ভাবা দরকার। যাই হোক, আমি এটি আসলে অন্য ধারার একটি কথা বললাম আজকে। আপনারা ভাববেন, যারা বিশেষ করে উম্মাহ্কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা যদি ভাবেন অথবা আমাদের এই ভাবনাগুলোর মধ্যে বা আমার এই ভাবনার মধ্যে কোন ক্রটি দেখতে পান সেই ক্রটিটাও যদি আমাদেরকে দেখিয়ে দেন সেটাও আমাদের জন্যে উপকারী হবে। সকলকে আবারও আমার মোবারকবাদ। এবারে আমাদের সা'মা মাহফিল হবে। এই সা'মা, তাজিমি সিজদা - এগুলো মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার কোন মৌলিক বিষয় নয়, অনুষঙ্গ মাত্র। অনুপ্রেরণার একটা অনুষঙ্গ। কিন্তু এগুলো নিয়েও নানান কথা হয়। ঐ যে বললাম, বলা হচ্ছে শরীয়তে নেই; আসলে ফিকাহতে সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু উনি বলছেন শরীয়তে

নেই; আসলে ফিকাহতে সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু উনি বলছেন শরীয়তে নেই। ইদানিং আমরা জেনেছি যে, একজন অত্যন্ত কুৎসিতভাবে, নোংরাভাবে বলেছেন যে, এটা চোর-ডাকাত এর মত একটা কাজ। এখন এটি যদি এরকম কাজ হয়, বিখ্যাত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ এটার নাম “ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ” হযরত নিজামুদ্দিন চিশ্তি নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে ঘিরে উনার যে মজলিস ছিল সে মজলিসের বিবরণের বই। এখানে অসংখ্য বার উনার সামনে কপাল স্থাপন অর্থাৎ আমরা যেটাকে তাজিমি সিজদা বলছি উনারা এটাকে আরেক ভাষায় বলছেন, কিন্তু কাজটা একই, “জমিন বুচি” জমিনে কপাল স্থাপন। উনাকে তাজিম করত। এমনকি ওখানে এমন একটি অধ্যায়ও আছে যেখানে এটি বলা হয়েছে যে একবার নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে একজন তর্ক করছে- আপনাকে এভাবে সিজদা করে আপনি বাধা দেন না কেন? উনি এটির জবাব দিয়েছেন।

এখন এটি যদি চোর-ডাকাতের মতো কাজ (নাউযুবিল্লাহ্, আমার বলতে ইচ্ছে করছে না এত নোংরা ভাষায় এটি বলা হয়েছে) হয় তাহলে আমরা কি সেই দোষে চিশ্তিয়া খান্দানের একজন মহান অলি খাজা নিজামুদ্দিন চিশ্তি (রহ.)কে দোষী করব? তাঁকে চোর-ডাকাত বলব? কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা অনুযায়ী তা-ই হয়। ইমাম শেরে বাংলা বলেছেন- মাইজভাণ্ডার শরিফ হচ্ছে “সজিদা গাহে আশেকা”। তাহলে ইমাম শেরে বাংলাও চোর-ডাকাত হয়ে গেলেন (নাউযুবিল্লাহ্)! এগুলো বলে আমরা কোথায় পৌঁছাচ্ছি? কোথায় পৌঁছাতে চাচ্ছি? কাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, কোন একটা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়ছি কিনা? আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি অপবাদ পোষণকারী হয়ে পড়ছি কিনা - আমাদের ভেবে দেখা দরকার। এ ধরনের বক্তব্যের আমরা নিন্দা জানাই এবং এ বক্তব্যের যিনি বক্তা তার হেদায়তের জন্যে, তার সঠিক বুঝ ব্যবস্থার জন্যে পরম করুণাময়ের দরবারে আমরা দোয়া করছি।

সবাইকে মোবারকবাদ, এখন সা'মা মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। তারপরে দোয়া হবে, তারপর তাবারুক্ক বিতরণ হবে, তারপর আপনারা যার যার আলয়ে ফেরত যাবেন।

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন সকলে যাতে নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারেন তার জন্যে সকলের যাত্রাকে নিরাপদ করুন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

বেলায়তে মোত্লাকা সপ্তম পরিচ্ছেদ

খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.)

বেলায়তের দুই যুগের বিকাশ

বেলায়তে মোকাইয়াদা এবং বেলায়তে মোত্লাকা

কবরে ও পুকুরে পবিত্র কোরআনের পাতা নিষ্ক্ষেপ:

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) নিজ হাতে লেখা কোনো বই-পুস্তক কিংবা কিতাবাদি রেখে যান নি। তাঁর প্রভাবশালী (প্রভাব বিস্তারকারী) পবিত্র কথাবার্তা ও দৈনন্দিন অলৌকিক কর্মপদ্ধতিই তাঁর (বেলায়তের) পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। যেমন, পবিত্র কোরআনের দশটি পাতা সামনের পুকুরে এবং সতেরটি পাতা তাঁর একমাত্র পুত্র মরহুম সৈয়দ মাওলানা ফয়জুল হক সাহেবের কবরের উপর রাখার আদেশ-নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই (নজর দিলেই) এবং তাঁর বলা কথা অনুসারে, “কম্বখতরা কালামুল্লাহ বেচে (বিক্রি করে) কলামোলা খেয়েছে”-ইত্যাদি বাণীর বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, জনগণ পবিত্র কালামুল্লাহর রুহানি দিক ছেড়ে ছোট শিশুদের মতো সহজসুলভ ভোগ্যবস্তুতে আকৃষ্ট হয়েছে। এমন কী তারা পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা করছে। এতে পবিত্র কোরআনের লিখিত বস্তু (বিষয়বস্তু) তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে না।

তাই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) পবিত্র কোরআনের ‘দশ’ পাতা দ্বারা সর্বসাধারণের অন্তরের মলিনতা বিদূরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। যেমন দেখা যায়, পবিত্র ‘কোরআন’-কে পবিত্র কোরআন পাকে “শেফাউল লিমাফিস সুদুর”, অর্থাৎ অন্তরের বিমার (অন্তরের অসুখ বা অসুস্থতা) দূরকারী বলে উল্লেখ আছে। (যেহেতু গণিতে বা গণিত শাস্ত্র মতে এই ‘দশ’ হচ্ছে চরম সংখ্যা)। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) তাঁর ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউসুল আযমিয়তের প্রভাবে জনসাধারণকে বালা-মুসিবত ও সংসার ঝামেলা থেকে নাজাত দেবেন এবং যারা খোদা তালেব বা খোদা অন্বেষণকারী তাদের অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম-প্রেরণার জলধারা সিঞ্চনে অনন্ত জীবন দান করবেন। তাঁর উপরোক্ত বাণী সমূহের সারমর্ম ও কার্যপ্রক্রিয়া সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ও মঙ্গলময় ইঙ্গিতবাহী এবং নৈতিক পতনযুগে মুক্তির দিশারী। এই হচ্ছে কোরআন পাকের দশ পাতা পুকুরে ফেলার রহস্য। পুকুরের জল যেমন পুকুরে অবতরণকারীকে শান্তি দান করে, ঠিক সে রকম তাঁকে অনুসরণকারীও খোদার নাম স্মরণ করে শান্তি লাভ করবে; তাঁকে অনুসরণ, খোদা স্মরণকারীর দশজ্ঞানেন্দ্রিয়কে রুহানি প্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে সজাগ

করবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হচ্ছে: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক। মানবপ্রকৃতি (মানবস্বভাব) অনুভূতি লাভের দিক দিয়ে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের (পাঁচ ইন্দ্রিয়ের) সাহায্যে বাহ্যিক (বাইরের) জ্ঞান আহরণ করে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক মনের (অন্তঃকরণের) সাহায্যে, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সমূহের সাথে সম্পর্কিত শরীরের অভ্যন্তরীণ পঞ্চেন্দ্রিয়ও সেই জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করে (সেই জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয়)। এই দশ প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ (বাইরের ও ভেতরের) জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তির স্রষ্টানুরাগী নিত্যে আসক্ত (চিরস্থায়ী স্রষ্টা অনুরাগে মগ্ন) ও অনিত্যে আসক্ত সংসারানুরাগী (অস্থায়ী সংসারের অনুরাগে মগ্ন) এই দুই ভাগে বিভক্ত।

যারা সিদ্ধ-কামেল ব্যক্তির প্রতি অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল এরকম দশজন বা জনগণের জন্য হযরত মুসা’র (আ.) বারোটি জল-প্রবাহের (জল-প্রবহন বা জলধারা) মতো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) ফয়েজ বরকতের জলধারাতে পবিত্র কোরআনের দশটি অংশ বা পাতা নিষ্ক্ষেপের দ্বারা এই ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) অনুসারি বা তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থী জনগণ বা প্রত্যেক মানুষ তাদের সুবিধা অনুযায়ী যেন তাঁর ফয়েজ বরকত ভোগ (অর্জন) করতে পারেন।

যারা সংসার অনুরাগী বা অনিত্যে আসক্ত, তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পরম স্থায়ী সত্য স্রষ্টানুরাগের অভাবে মৃতপ্রায় ও নির্জীব। রুহানি জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান আহরণে তারা অসমর্থ, তাই তাদের উদ্দেশ্যেও কোরআনী হেদায়েত বস্তু হিসাবে কোরআন পাকের দশটি পাতা এবং অংশ বা সর্বজনীন হিসাবে তাঁর অনুরাগী বা বিরাগী প্রত্যেকের জন্য সাতটি পাতা যা হযরত আকদাস (ক.) শুদ্ধি প্রণালীর স্বাভাবিক ও সহজতম কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সংসার জীবনযাত্রায় মানুষ যেমন বাসন-কোসন পরিষ্কার করে দিলে সেগুলো যেভাবে পুনরায় কার্যকর শক্তিসম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার ঝামেলা থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার হয়ে কার্যক্ষমতা সম্পন্ন শক্তি লাভ করবে।

জীবন নামে আখ্যায়িত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করে মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে ঠিক তেমনি হযরত

আকদাসের (ক.) বেলায়তসুখা পানকারীও সুফিমত অনুসারে ফানা-ই-ছালাছা বা রিপূর ত্রিবিধ (তিন ধরনের) বিনাশ স্তর অতিক্রম করে পবিত্র হাদিস অনুসারে “মুতু কুব্বা আন তামুতু” (১) রূপের চার প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করে খোদা পরিচিতি জগতে (আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জগতে) সুফি পরিভাষা অনুসারে “হায়াত-ই-আবেদি” নামের নিত্যজীবন (স্থায়ী জীবন) লাভ করে। এই জীবনের সাহায্যে মানুষ, খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হয়ে উর্ধ্বতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক ‘কশ্ফি’ (অদৃশ্য বিষয়ের প্রকাশিত জ্ঞান) নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যা সন্দেহের অতীত বা যাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরোক্ত তত্ত্ব, হযরত আকদাসের (ক.) দ্বারা কবরে কোরআন পাকের সতের পাতা রাখার ইঙ্গিত বহন করে। “ফানা-ই-ছালাছা ও মউত-ই-আরবা” (প্রথমটি তিন প্রকার দ্বিতীয়টি চার প্রকার) মোট সাত প্রকার কার্যকরি শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থাকে প্রত্যক্ষ কোরআনি হেদায়েত বলে হযরত আকদাস (ক.) সাব্যস্ত করেন। যা সব সম্প্রদায় ও সব ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য, যাকে বলা হয় ‘আইন-উল-একিন’ বা বিশ্বাসের আইন বা নিয়ম এবং ‘হক্কুল একিন’ বা বিশ্বাসের সত্য থেকে উদ্ধৃত বা বিকশিত বিষয়।

এখানে এই আলোচনায় ফানা-ই-ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ (রিপূ দমনের তিন ধরনের পদ্ধতি) পদ্ধতির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাসের (ক.) একটি ভাবপ্রবণ উক্তি (কালাম) তুলে ধরা (উদ্ধৃত করা) প্রয়োজন বলে মনে করি। যার ফলে এবিষয়ক দৃষ্টান্ত বুঝার প্রক্রিয়াটি সহজসাধ্য হবে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) তাঁর ভাববিভোরতার পরক্ষণে কোনো কোনো সময় বলতেন-

“(ক) আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই

(খ) ভেড়া দিয়া ভৈষ (মহিষ) দাবাই

(গ) বানর দিয়া বাঘ দাবাই”।

এইসব রহস্যময় বাণীর (উচ্চারিত কালাম) সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়, এই দৃশ্যমান জগতের (নাসুত) পশুস্তরের প্রতি (পশুদের মতো আচরণের প্রতি) মানুষের আকৃষ্ট। (বাণী সমূহের আলোকে যা অনুধাবন করা দরকার তার বিশ্লেষণ নীচে দেয়া হলো।)

বাণী (ক): যারা পরের স্বার্থে পরের ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়েছেন অথবা নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ক্ষণভঙ্গুর (অস্থায়ী) পার্থিব গরজে খোদা-ভোলা (সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে আছেন) তারা বলদের মতো নিরীহ ও অসহায়। তাদের রুহের বা আত্মার মঙ্গলের জন্য ছাগলের মতো (ছাগ জাতীয় প্রাণীর গুচিতা বা পরিষ্কার থাকার স্বভাব) পাকসারফ বা পবিত্র থাকা প্রয়োজন। সেই সাথে তাদের উচিৎ নির্দোষ, হালাল, বৈধ, স্বচ্ছ খাদ্য (মলিনতা ও অপবিত্রতামুক্ত)

গ্রহণ, আলস্য পরিহার করা এবং নিজের মননগত চিন্তাধারার দিক দিয়ে স্রষ্টা অনুরাগী হয়ে উঠা, স্রষ্টার স্মরণ অন্তরে জাহত করা এবং সজাগচিত্ত (মনের সতর্কতা নিয়ে থাকা) থাকা। যার ফলে যিনি ‘সালেক’ তিনি প্রথম স্তরের বিনাশ পদ্ধতি (রিপূ দমন পদ্ধতি) “ফানা আনিল খাল্ক” বা পরমুখাপেক্ষিতা দোষ বিবর্জিত (পরমুখাপেক্ষিতার দোষ থেকে মুক্ত) খোদা অভিমুখের পথিক বা পথচারী হিসাবে সাব্যস্ত (গণ্য) হবেন। **বাণী (খ):** যারা মহিষের মতো অহমমত্ত (উদ্ধত দুর্বীণিত স্বভাবের) তারা সমাজের দুর্বৃত্ত-দুর্জন (আঞ্চলিক ভাষায় ‘ফাউট্রা’) হিসাবে পরিচিত। এরকম স্বভাবের মানুষেরা স্ব-স্ব প্রাকৃতিক বিচরণস্থল থেকে হীন-জঘন্য কাজের জন্য বেরিয়ে আসা আবাসত্যাগী ক্ষিপ্ত বাঘ কিংবা পাশবকাম প্রবৃত্তিতাড়িত পাগলা মহিষের মতো। যারা নির্বিচারে অনর্থ সৃষ্টিকারী (অনিষ্ট সৃষ্টিকারী) কাজে লিপ্ত, তাদের মুক্তির জন্য সমাজবদ্ধ আচার, ধর্মনিষ্ঠ কামেল (সত্যসাধনায় সিদ্ধ মানুষ) বা ধর্মীয় নিষ্ঠায় উন্নতচিত্ত হয়ে উঠা ব্যক্তির সাহচর্য, পাপ (থেকে) বিরতকারী বাণী ও কর্মের (মহৎ ও সৎ কর্মের) একান্ত দরকার। যেহেতু এই পশু স্বভাবের মানুষদেরকে গোণী (অপ্রধান নীচ শ্রেণীভুক্ত) বা মোকাল্লেদ (খারাপ স্বভাবের অন্ধ অনুসারী) বলে, তাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে অনর্থ সৃষ্টিকারী কর্ম পরিহার, যা না হলে কিংবা না বললে চলে সেরকম কাজ বা কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা, অপরের দোষ খোঁজার অভ্যাস ত্যাগ করা এবং একনিষ্ঠ ধ্যান ও আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করা একান্তভাবে দরকার। (২) এরকম পরিশুদ্ধি অর্জনকারী মানুষদের জন্য হযরত মুহাম্মদ (দ.) বেহেশতের যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা আছে (সূরা নাযি’আত)। (৩)

বাণী (গ): ন্যায়নীতি বিবর্জিত হৃদয়হীন মানুষেরা হচ্ছে অন্য মানুষের কাছে রক্তলোলুপ হিংস্র বাঘের মতো; এই হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করে মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট বানরের মতো প্রাকৃতিক (উদ্ভিজ) খাদ্যের উপর তাদের নির্ভরশীল হওয়া খুবই দরকার। এরই ফলাফল হিসাবে খোদার ইচ্ছাশক্তির কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করার মধ্য দিয়ে খোদানির্ভরতা অর্জনকারী প্রাণ খোদার কাছ থেকেই খাদ্য লাভে (রিজিক) সমর্থ হয়। এই বিষয়টিকে সুফি দর্শন অনুসারে বলা হয় ‘তসলিম ও রজা’ বা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত পুণ্যবান মানুষের আত্মার গুণজ স্বভাবের সুফল। মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.) বলেন, “তুমি ফেরেশতা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত। পশুর স্বভাব থেকে মুক্ত হও, তাহলে ফেরেশতার স্বভাব অতিক্রম করে আরো উর্ধ্বে উঠে যেতে সক্ষম হবে।” (৪)

কাজেই এখানে বুঝার সুযোগ রয়েছে যে, নবী রসূল,

অলি-ই-কামেল মানব জাতিকে স্রষ্টা অনুরাগ দানের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থিব মোহ-অনুরাগ শিথিল করার মধ্য দিয়ে চরিত্রবান কর্মঠ মানব সৃষ্টি করেন। তাই কোরআন মজিদের প্রথম ভাগে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেছেন, “গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম অলাদোয়াল্লিন”। এই আয়াত শরিফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত ইবনে আরাবি (র.) তাঁর নিজের করা তফসিরে লিখেছেন, যারা আল্লাহুতায়ালার ‘রহমান রহিম’ এই গুণজ নামের ভরসায় বেপরোয়াভাবে পাপে লিপ্ত হয় তারা ‘মগদুবিন’-গজবের (মগজুবিন-গজব) দ্বারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং যারা খোদাতায়লা প্রদত্ত কল্যাণ (ভালাই) গ্রহণ করে না; অলস প্রকৃতির মধ্য দিয়ে খোদাপ্রদত্ত কল্যাণকে (ভালাইকে) যারা নিজের মঙ্গলের জন্য (হিতার্থে) কাজে লাগায় না, যারা কর্মবিমুখ ও অস্বীকারকারী (সত্য অস্বীকারকারী), তারা ‘দোয়াল্লিন’ বা পথভ্রষ্ট (সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত)। যারা এখানে উল্লেখিত উভয় পন্থার প্রতি নজর দিয়ে (সতর্ক দৃষ্টি আরোপ করে) মহান আল্লাহ ও আল্লাহর প্রিয় নবী-অলি’র অনুগত হয়ে কল্যাণের পথে (ভালাইর পথে) চলে (অগ্রসর হয়), তারাই মুসলমান বা শান্তিপ্রিয় জাতি, তারাই খোদার দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য, তারাই বিশ্বমানবতার প্রতীক।”

এতে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত ধর্মব্যবসায়ী পুণ্যহীন ও নীতিহীন বাক্য (কথাবার্তা) দ্বারা জনগণকে পাপকাজে উৎসাহিত করেন এবং বলে বেড়ান ‘যে যত করে পাপ, টাকার কল্যাণে হয়ে যায় মাফ’ ইত্যাদি, এই বাক্য উচ্চারণকারীরা ভণ্ড, সৎপথ প্রদর্শক নয়। ঐ সব মানুষেরাই মানব পদবাচ্য বা সত্যিকার মানব বলে অভিহিত হন- যারা সৎকর্ম অনুরাগী এবং যাদের রয়েছে শাস্তিস্বীকৃত চরিত্র।

সপ্তকর্ম পদ্ধতি

১. ফানা-ই-ছালাছা বা রিপূর ত্রিবিধ বিনাশসাধনের স্তর:

(ক) ‘ফানা আনিল খাল্ক’ অর্থাৎ কারো কাছে কেনো ধরনের উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজের শক্তিসামর্থ্যের প্রতি নিজ মনে আস্থা জন্ম নেয়।

(খ) ‘ফানা আনিল হা’ওয়া’ যা না হলেও চলে সে রকম কাজ কর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। এর ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়।

(গ) ‘ফানা আনিল এরাদা’ অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রধান্য দেয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার কাছে বিলীন করে দেয়া, যার ফলে সুফি মত অনুসারে ‘তসলিম ও রজা’ হাসিল (অর্জিত) হয়।

২. মউত-ই-আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু:

(ক) ‘মউত-ই-আব্বইয়াজ’ বা সাদা মৃত্যু: এটি উপবাস এবং সংযমের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়। যার ফলে মানব মনে আলো বা

উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন: রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদির মাধ্যমে উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে উপবাস করতেন এবং বলতেন, ‘উপবাসে আমি আলো পাই’।

(খ) ‘মউত-ই-আসওয়াদ’ বা কালো মৃত্যু: এটি শত্রুর শত্রুত ও নিন্দাতে হাসিল (অর্জিত) হয়। কারণ, অন্যের নিন্দা বা সমালোচনার পর কোনো মানুষ যখন নিজের মধ্যেই ঐ নিন্দার কারণ ও দোষত্রুটি খুঁজে পায় তখন সে অন্ততঃ হয়ে উঠতে পারে, ঐসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তির জন্য সে কাতর হয়ে মহান আল্লাহুতায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায়। আর যদি অন্যের উপর আরোপিত দোষত্রুটি নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, নিজে ঐসব দোষ থেকে মুক্ত বলে স্থির নিশ্চিত হয়, তখন সেই মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি শোকরিয়াহ জ্ঞাপনের (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের) মনোবল অর্জন করে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন ‘বন্ধু’ বলে মনে হতে থাকে।

(গ) ‘মউত-ই-আহমর’ বা লাল মৃত্যু: এটা কামভাব ও লালসা থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে অর্জিত (হাসিল) হয়। যিনি এটি অর্জন করতে পারেন তিনিই বেলায়তপ্রাপ্ত হয়ে অলি-ই-কামেলের মধ্যে গণ্য হন।

(ঘ) ‘মউত-ই-আখজার বা সবুজ মৃত্যু: নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে এটি হাসিল বা অর্জিত হয়। যার ফলে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রতি প্রেম-ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো কামনা-বাসনা থাকে না। এটি বেলায়তে খিজিরির অন্তর্গত।

এই হলো কোরআনের হেদায়েতের সপ্ত-পদ্ধতি, মানব জীবনের জন্য এক নিখুঁত সহজ-সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যা মানবের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। জনাব গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল নীতি থেকে এটি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। যেহেতু সৎ-অসৎ বস্তুকে তুলান্ডে তুলে চুলচেরা বিচার করা বর্তমান সময়ে কঠোর প্রতিবন্ধকতার বেড়া জালে আবদ্ধ, যেহেতু কঠোর সাধনা বা ইবাদত, বর্তমান যুগের অতিকামনা পূরণে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির যুগে সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে, সুতরাং সেহেতু এই সপ্ত-পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা এবং সংসার জীবনকে সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে, এই সপ্ত-পদ্ধতিই মানুষের জীবনকে অপরের দুঃখ-কষ্টের কারণ না বানিয়ে বরং বন্ধুসুলভ ও পর-হিতার্থী করে তোলে। এই সপ্ত-পদ্ধতি ইসলামি সুফি মতবাদ অনুসারে ‘ফানা-ই-নফসি’ প্রবৃত্তির (রিপুতাড়িত আচরণ) বিনাশ এবং ‘বাকাবিলাহ’র বিভিন্ন উসুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত। এই সপ্ত-পদ্ধতি অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনাসিদ্ধির নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে বিরোধাত্মক নয়, বরং

উৎসাহ-বর্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্বসমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী। এই সপ্ত-পদ্ধতি কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী, এটি ব্যবসাদারি (ব্যবসাই মূল লক্ষ্য যাদের) পীরত্বের সমর্থক নয়, এই সপ্ত-পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে নিষ্কাম খোদাশ্রেয় সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এ সময়ে পীরগিরি ব্যবসায়ের নামে যে অধঃপতিত যুগের সৃষ্টি হয়েছে সপ্ত-পদ্ধতি তা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে তাদের মধ্যে নৈতিক ধর্মের জীবনদানকারী প্রবর্তার মতো। এই সপ্ত-পদ্ধতিই ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলোদানকারী পবিত্র আত্মিক আলোর উৎস। পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় যাকে বলা হয়েছে ‘কাউকাবুন দুর্রিইউ’ যার অর্থ আলোক-উজ্জ্বল তারকা।

খোদা-অনুরাগ নীতিতে ‘নিসবতাইন-ই-আদমী’-কে বিগত-আগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী বলা হয় বিধায় তিনিই ‘খাতেম’ বা সনদদাতা। সুতরাং বলা যায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)-এর এই সপ্ত-পদ্ধতিই হচ্ছে তাঁর বেলায়তের রহস্য, তাঁর বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসিয়তের এক উজ্জ্বল নজির বা দৃষ্টান্ত। হাফেজ সিরাজি (র.)-এর ভাষায় বলতে হয়: “তোমার চোখের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বের করলো, তখন দিল-ঘায়েল জিন্দা মানুষগুলো একের উপর অপরজন ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো।” (৫)

হযরত আকদাস (ক.)-এর বেলায়ত-রহস্য এবং তাঁর ত্রাণ কর্তৃত্বসম্পন্ন গাউসিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নানারূপে। মাওলানা আবদুল হাদী (র.) রচিত রত্নভাণ্ডার-এর ৩৬ নম্বর শের এর উজ্জ্বল প্রমাণ ঘোষণা করে। যেমন:

“চলগো প্রেম-সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।

প্রেম-হাট বসাইয়াছে মাইজভাগুর মাঝার ॥

সেখা এক মহাজন নুরে আলম গাউস ধন।

সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার ॥

প্রেম-রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাফটা দিল কিনিয়ে

সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ॥”

লেখা বিশ্বাসের পর্যায়ের বস্তু, এতে মূলবস্তু দৃশ্যমান নয়। সে জন্য নিজ গদি শরিফে বসে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) ঐ সময় আমাকে কোরআন শরিফ দেখিয়ে বলেছিলেন, “দেখ দাদা ময়না! হরফ আছে কী?” তিনি এরকম দু’বার দেখিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করে দু’বার নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, “সমস্ত হরফ উড়ে গিয়েছে”। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাই সত্য। কোরআন পাকে যে লিখিত হেদায়েত বিদ্যমান আছে, সেদিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পীরানে পীর দস্তগীর শাহ-ই-বাগদাদি গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-এর বাণী: “ওহে

আমার পেয়ারা, তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আত্মহাস্তি হও; এগিয়ে এসো, আমি তোমার মঙ্গলাকাজক্ষী। তোমার জন্য দোয়া করি। আর যখন আত্মহবিমুখ হও, পিছু ফিরো, আমি তখনও আগের মতো থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি। যেহেতু পিছন দিকে কিছু দেয়া-নেয়ার নিয়ম নেই।” (৬) এরকম কল্যাণকামি বহু সুফিসাধকের হিতকর বাণী ও নৈতিক গ্রন্থাবলি লিখিত আকারে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণে সেগুলোর উপকারিতা থেকেও জনগণ বঞ্চিত। গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) খাতেমুল অলি এবং আওলাদ। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান ‘ফয়েজ-ই-মোজাররদ’। পুকুরের মতোই কারো দ্বারে তিনি যান না কিংবা কারো মুখাপেক্ষিও তিনি নন। সবাই তাঁর দ্বারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে এসে থাকেন এবং স্ব-স্ব পাত্র অনুযায়ী তাঁর দান তারা প্রত্যেকে নিয়ে যান। এই বেলায়ত-রহস্য ব্যক্ত করার জন্য আমি অধিকার সম্পন্ন (অধিকারপ্রাপ্ত) ব্যক্তি, যেহেতু গাউসুল আযম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)-এর আমি “অসি”। তিনি বেসাল হওয়ার কয়েকদিন আগে আমাকে তাঁর গদি শরিফের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন, হযরত আলী (ক.)-এর বাণী: “এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যা নবী অথবা নবীর অসি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না।” (৭) এই জ্ঞান রুহানি প্রেরণাসম্বৃত ‘মুলকুল ইলহাম’ বা ইলহামি ফেরেশতার কাজ-কারবারের পর্যায়ভুক্ত। সুফি পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইলম-ই-লাদুন্নি।

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. হাদিস শরিফ, “মৃত্ত কব্‌লা আন তমৃত্ত”
২. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৩. কোরআন শরিফ, সূরা: নাযি’আত
৪. মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৫. হাফেজ সিরাজি (র.)
৬. গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)
৭. দিওয়ান-ই-আলী, হযরত আলী (রা.)

সহায়ক গ্রন্থ:

- ক. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত ‘BELAYET-E-MUTLAKA’ (The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God), ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, প্রকাশনী: আঞ্জুমান-ই-মুত্তাবেয়িন-ই-গাউস-ই-মাইজভাগুরী, চট্টগ্রাম।
- খ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ: জৈষ্ঠ্য ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ।

উম্মুল মু'মিনিন হযরত জুয়াইরিয়া বিন্তে হারিছ (রা.)

মোঃ গোলাম রসুল

প্রকৃত নাম বাররাহ্। তিনি খাজায়া গোত্রের মুসতালিক বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো : বাররাহ্ বিনতে হারিছ বিন আবি জারার বিন হাবিব বিন আয়েজ বিন মালিক বিন হাযিমা (মুসতালিক)। চাচাতো ভাই মাসাফি বিন সাফওয়ানের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিলো। মুরাইসি'র যুদ্ধে মাসাফি বিন সাফওয়ান নিহত হয়। তখন হযরত জুয়াইরিয়ার (রা.) বয়স ছিল বিশ বছর।

ইসলাম নারীকে 'মা' হিসেবে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের সম্মানের উপর এক সম্মানই বাকি আছে, তা হলো আল্লাহর মর্যাদা। আল্লাহ্‌পাক বলেন, “আর আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না; আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে” (বনী ইসরাইল-২৩)।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর পিতা হারেছ বনু মুসতারিক গোত্রের সর্দার ছিলেন। কোরাইশের ইঙ্গিতে মদীনার ওপর হামলা করার জন্য তিনি নিজের গোত্রকে প্রস্তুত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এ খবর পেয়ে পঞ্চম হিজরীর ২রা শাবান মুজাহিদের একটি দল সাথে নিয়ে বনু মুসতালিকের দিকে রওনা হলেন। হারেছ মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পালিয়ে গেলেন। রাসূলে করিম (দ.) মুরাইসিতে অবস্থান করলেন। এখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করলো। কিন্তু তারা পরাজিত হলো। তাদের ১১ ব্যক্তি নিহত এবং ৬শ' জন গ্রেফতার হলো। এ কয়েদীদের মধ্যে হযরত জুয়াইরিয়াও (রা.) ছিলেন। গণিমতের মাল বণ্টনের পর তিনি হযরত ছাবিত বিন কায়েস (রা.)-এর অংশে এলেন। বস্ত্রত তিনি ছিলেন সর্দার কন্যা। এজন্য দাসী হিসেবে থাকা অসহনীয় হয়ে উঠলো। হযরত ছাবিত (রা.)-এর কাছে কিছু অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দেয়ার জন্য তিনি আবেদন জানালেন। তাতে তিনি সম্মত হলেন এবং হযরত ছাবিত (রা.) নয় আওকিয়া স্বর্ণ দাবি করলেন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ইতোমধ্যে রাসূল (দ.) খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, “আমি একজন মুসিবতজাদাহ, আযাদ হতে চাই, অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন।” নবী করিম (দ.) বললেন, “এটাই কি ঠিক হবে না যে, আমি তোমার আযাদীর বিনিময় মূল্য আদায় করে তোমাকে বিয়ে করবো!”

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। সুতরাং নবী করিম (দ.) বিনিময় মূল্য আদায় করে তাঁকে বিয়ে করলেন এবং প্রথম নাম বাররাহ্ পরিবর্তন করে জুয়াইরিয়া রাখলেন। তিনি হেরেমে প্রবেশ করতেই সাহাবাগণ নবী করিম (দ.)-এর আত্মীয়তাকে সম্মান করে সকল যুদ্ধ বন্দিকে মুক্ত করে দিলেন। ইবনে আছির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় বনু মুসতালিক গোত্রের একশ পরিবার স্বাধীনতার নেয়ামতে ভূষিত হয়েছিলেন।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, “আমি হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) থেকে বেশি অন্য কোনো মহিলাকে নিজের গোত্রের জন্য রহমত হিসেবে দেখিনি।”

আল্লাহ্ বলেন, “আমার নির্দেশসমূহের মধ্যে একটি হলো, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ করো। আর আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে” (সূরা রুম-২১)।

ইবনে আছির (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-এর পিতা খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর কন্যাকে দাসী বানানো হয়েছে। এতে তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনা রওনা হলেন। পথিমধ্যে দু'টি পছন্দনীয় উট আকীক নামক স্থানে কোনো ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট এবং সম্পদ ও আসবাবসহ মদীনা পৌঁছলেন। অতঃপর নবী করিম (দ.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন- “আপনি আমার কন্যাকে বন্দি করে এনেছেন। এসব মাল ও আসবাব নিন এবং তাকে মুক্ত করে দিন।”

নবী করিম (দ.) গায়েব থেকে খবর পেলেন, এ ব্যক্তি দু'টি উট লুকিয়ে রেখে এসেছে। তিনি বললেন, “যে দু'টি উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছো, তা কোথায়?” হারিছ এ কথা শুনে হযরান হয়ে গেলেন। সাথে সাথে নবী করিম (দ.)-এর পদ চুম্বন করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অন্য এক রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে যে, হারিছ নবী করিম (দ.) খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, “আমি আরবের একজন সর্দার। আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আপনি তাকে আযাদ করে দিন।”

নবী করিম (দ.) বললেন, “ব্যাপারটি তোমার কন্যার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।” হারিছ কন্যাকে বললেন, “মুহাম্মদ (দ.) তোমার ওপরই বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছে। দেখ, আমাকে অপমানিত করো না।” তিনি বললেন, “আমি নবী করিম (দ.)-এর গোলামী করা পছন্দ করি।” সুতরাং নবী করিম (দ.) তাঁকে বিয়ে করলেন।

ইবনে সা'দ (রা.) বলেছেন, “হারিছ কন্যার ফিদিয়া মূল্য নবী করিম (দ.) আদায় করে দিলেন এবং যখন তিনি স্বাধীন হয়ে গেলেন তখন নবী করিম (দ.) তাঁকে বিয়ে করলেন।” এর ফলে তাদের গোত্র পূর্ব শত্রুতা ভুলে গিয়ে সর্বক্ষেত্রে রাসূল (দ.)-এর শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে থাকে।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) অত্যন্ত ইবাদত গুজার ছিলেন। তিনি তাঁর হুজরায় মসজিদ নামে একটি জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সেখানে তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একবার সকালের দিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) তশরিফ নিয়ে দেখেন, তিনি ইবাদতে মশগুল। তখন হুজুর (দ.) ফিরে যান। দ্বিপ্রহরে আবার আসলে তখনও তাঁকে ইবাদতে দেখতে পান। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সকাল থেকে এখনো ইবাদতে মশগুল? তুমি কি সব সময়ই এভাবে ইবাদত করে থাকো? উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) জবাব দেন, “অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল (দ.)”। রাসূল করিম (দ.) যখনই গৃহে আসতেন তখনই তাঁকে ইবাদতে মশগুল দেখতেন। সব কথা শুনে বিশ্বনবী (দ.) তাঁকে চারটি কলেমা শিখিয়ে দিয়ে বললেন, কলেমাগুলো তিনবার করে পাঠ করলে দীর্ঘক্ষণ ইবাদতের চেয়েও ওজনে ভারী হবে।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ৬৫ বছর বয়সে ৫০ হিজরীতে ওফাত হন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) কর্তৃক কয়েকটি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) এবং হযরত জাবের (রা.) এর মতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

সূত্র:

১. কোরআন শরিফ
২. ঈমান, আমল, ইলম-ড. ইবনে আশরাফ, রিমঝিম প্রকাশনী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৩. দুইশত একত্রিশজন মহিলা সাহাবী ও বেহেশতী রমণীগণ, মোসাম্মাৎ আমেনা বেগম, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সুফি উদ্ধৃতি

- মানুষ হতে ইজ্জত পাওয়ার পিছনে ঘুরাফেরা করোনা, গৌরবের বোতল পাথর দিয়ে ভেঙ্গে ফেল।
- গৌরবের বোতল যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাঙবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার অন্তরে আলো উজ্জ্বল হতে না।
- তুমি নিজের অস্তিত্ব বিলীন কর, যে ব্যক্তি মাশুকের মিলন পিয়াসী তাঁর নিকট মাশুক ব্যতীত নিজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।
- পতঙ্গের মত প্রেমাগ্নিতে দক্ষ হও, তখন মাশুকের খবর পেতে সক্ষম হবে।
- যদি তুমি আল্লাহকে ও চাও এবং ফেরবের দ্বারা নাপাক দুনিয়ার প্রতিও আসক্ত হও, আল্লাহপাকের খাছ আস্তানায় দুনিয়াদারদের প্রবেশ নিষেধ।
- প্রেমই গ্রহণ কর, নিজেকে ভুলে যাও। গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর পায়ের ধুলা হয়ে যাও।
- ইলমে তাসাওউফ অতীব প্রয়োজনীয় ইলম, খোদা পরিচিতির দিশারী পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানবের সাহচর্যে উহা হাসেল হয়।
- ত্বরিকত পথের অন্বেষণ করা ও বাতেনী কামালিয়ত অর্জনের উদ্দেশ্যে সচেষ্টিত হওয়া প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব।
- ‘সেমা’ পূণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের প্রধান সহায়।
- ‘সেমা’র মধ্যে এমন গুণ রহস্য আমানত রয়েছে, যা দ্বারা খোদা প্রেমিকদের জন্য প্রেমাগ্নিতে দক্ষ হওয়ার স্বাদ রয়েছে।
- ‘সেমা’ দ্বারা আশেকদের কুল্ব নরম হয়ে যায়, যেমন আগুনে পাকানো বস্ত্র নরম হয়।
- দৈহিক সুস্থতা কুল্বের সুস্থতার প্রতিফলন।
- আল্লাহর প্রেমে যদি তুমি মগ্ন হও, ফিরিশতার মরতবার বহু উর্ধ্বে তোমার স্থান হবে।
- মুরিদের পক্ষে পীরে কামেলুল আকমলের উসিলা ব্যতীত মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছা সম্ভব নয়।
- যে মুরিদ পীরে কামেলের তাওয়াজ্জুহর বদৌলতে ফানা ও বাকার মকামে পৌঁছে, তাঁর অন্তরে ইলহামের পথ উন্মুক্ত হয় এবং জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

– মুফতি-এ আযম, আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.)

আহলে বাইতে রাসূল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ

অধ্যাপক জহুর উল আলম

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহুরা (রা.)
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র একমাত্র উত্তরাধিকারী হলেন
হযরত ফাতিমা যাহুরা (রা.)। তাঁর পবিত্র স্বামী বেলায়তের
সম্রাট হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.), তাঁদের দুই পুত্র
হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)
সহ বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র চাদরাবৃত পাঁচজন মিলে হলেন পাক
পঞ্চতন তথা পবিত্র পাঁচজন। বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্রতম
শোণিতের সরাসরি একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত
ফাতেমা (রা.)'র মর্যাদা ব্যতিক্রম এবং অনন্য। হযরত
ফাতিমা (রা.) পুণ্যবতী নারীদের সর্দার, বিশ্বনবী (দ.)'র
পরপর সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশের অধিকারপাশ্চ মহীয়সী
সর্বশ্রেষ্ঠা 'মুখাদ্দারা' তথা পর্দানসিনী। রাসূলুল্লাহ (দ.)'র
কনিষ্ঠ কন্যা হিসেবে তিনি সরাসরি বিশ্বনবী (দ.)'র নিকটে
শিক্ষা এবং দীক্ষা প্রাপ্ত হন। পরম স্নেহ এবং সমাদরে লালিত
হযরত ফাতিমা (রা.) কে কখনো বিশ্বনবী (দ.) তাঁর মাতা
উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কোব্রা (রা.)'র ওফাত
জনিত অনুতাপ ও অভাব অনুভব করতে দেন নি। গৃহের
অভ্যন্তরে তিনি স্বীয় কন্যাকে তালিম দিয়েছেন আল-
কোরআনের। হযরত ফাতিমা (রা.) কে তিনি গড়ে তুলেছেন
কোরআনিক প্রকৃতিতে পক্ষপাত মুক্ত আদলে। শৈশব-কৈশোর
থেকেই তাই হযরত ফাতিমা (রা.) স্বভাব চরিত্রে সাহেবা তথা
দুনিয়া-আখিরাতে মহিলাদের নেতৃত্বের অধিকারীনি হিসেবে
বিভূষিতা হয়েছেন।

আহলে বাইতের পুত্র পবিত্র সদস্য হিসেবে তাঁর স্বল্পায়ুর
পার্শ্বিক জীবন উপমাহীন চমৎকারিত্বে ভরপুর। বস্তুগত
ঐশ্বর্য-পরিত্যাগের মাধ্যমে চিত্তগত আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য
অর্জনের অনন্য উদাহরণ হলেন রাসূল নন্দিনী হযরত ফাতিমা
(রা.)। হযরত ফাতিমা (রা.)'র ভূমিষ্ঠকালীন মুহূর্ত ছিল ঐশী
অলৌকিকতায় উদ্ভাসিত আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ। রওজাতুল
শোহাদা, আলে রাসূল, আর রাওজুল ফায়েক গ্রন্থে হযরত
খাদিজাতুল কোব্রা (রা.)'র বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখ করা
হয়েছে, ফাতিমা (রা.)'র জন্ম মুহূর্তে তাঁর হৃদয় উপস্থিত
হযরত বিবি সারাহ, হযরত বিবি মরিয়ম, হযরত মুসা (আ.)'র
বোন হযরত কুলসুম, হযরত আছিয়াসহ বেহেশতি সাথীরা
উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজা (রা.)'র সেবায় জিকির
আজকারে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় হযরত ফাতিমা (রা.) ভূমিষ্ঠ

হন। মোল্লা হোসাইন কাশেফীর বর্ণনায় দেখা যায় জন্মের পর
হযরত ফাতিমা (রা.) কে অপরূপ সৌন্দর্যের মশক ভর্তি
বেহেশতি পানি দিয়ে গোসল দেয়া হয়। এরপর খুশবদার
শ্বেতবস্ত্র আবৃত করে হযরত ফাতিমা (রা.) কে উম্মুল মু'মিনিন
হযরত খাদিজা (রা.)'র কোলে তুলে দেয়া হয়। যথায়েরুল
উক্বা এবং মাদারেলজুন নবুয়ত কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা
যায় বিশ্বনবী (দ.)'র নিকট হযরত জিবরাইল (আ.) কর্তৃক
আনীত বেহেশ্তী আপেল ভক্ষণের পর হযরত ফাতেমা (রা.)'র
জন্মের সূচনা ঘটে। জমিনে শুভাগমনের পরপর হযরত
ফাতিমা (রা.) আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হন এবং আঙ্গুল
মোবারক তাঁর মহান পবিত্রতম পিতা হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র
মতো আসমানের দিকে উত্তোলন করেন। জন্মের পরপর তাঁর
এ ধরনের অবস্থানকে আল্লাহর নিকট মৌলিক ইবাদত হিসেবে
গৃহীত হয়। আর রাওজুল ফায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে যে
গর্ভাবস্থায় কাফিররা যখন বিশ্বনবী (দ.) কে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার
জন্যে দাবি জানিয়ে চাপ সৃষ্টি করলো তখন হযরত খাদিজা
(রা.) খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় গর্ভাবস্থায় হযরত
ফাতিমা (রা.) গায়েবী আওয়াজে তাঁর পুত্রপবিত্র আম্মাজানকে
অবহিত করে যে, “আম্মাজান আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার
মহান সম্মানিত আব্বাজানের সঙ্গে আল্লাহ স্বয়ং বিরাজমান
আছেন। ফয়সালা সেখান থেকেই আসবে।” উল্লেখ্য যে
বিশ্বনবী (দ.)'র চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের এই অতুলনীয় মুজিয়া
এখনো বিজ্ঞানী এবং গবেষকের ধারণা বহির্ভূত অথচ বস্তুনিষ্ঠ
ঘটনা হিসেবে প্রমাণ সর্বস্ব হওয়ায় সকল মানুষকে অভাবিত
ভাবনায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। রুহ জগতে হযরত ফাতিমা
(রা.)'র দিল চমকানো অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে সকল
পুণ্যার্থীরাই বিমোহিত হয়ে তাঁর পরিচয় জ্ঞাত হতে তৎপর হয়ে
উঠেন।

শৈশব-কৈশোর থেকেই হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন বিশ্বয়কর
ভাবনা চিন্তার প্রতিমূর্তি। হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বাবস্থায়
গাষ্টীয় এবং চিন্তায়ুক্ত থাকতেন বিধায় উম্মুল মু'মিনিন হযরত
খাদিজা (রা.) তাঁকে একবার তাঁর গাষ্টীয় এবং চিন্তিত থাকার
কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন,
“আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এক এক করে স্বতন্ত্রভাবে প্রেরণ না
করে এক সাথে প্রেরণ করতে পারতেন এবং একই সঙ্গে মৃত্যু
দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তা করেন নি কেন, এর

রহস্য নিয়ে চিন্তিত আছি। প্রিয় মাতার প্রতি এ ধরনের প্রশ্ন রাখলে কন্যার চিন্তা চেতনার গভীরতা দেখে বিস্মিত হযরত খাদিজা (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.) কেই প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরোধ জানান। প্রিয় মাতার নিকট থেকে অনুমতি পেয়ে শিশু হযরত ফাতিমা (রা.) জানান, “সবাই এক সঙ্গে দুনিয়াতে এসে একই সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে পৃথিবীতে দয়া, দাক্ষিণ্য, কল্যাণ, মায়া মমতার সৃষ্টি হতো না এবং কেউ কারো সুখ দুঃখের ভাগী হতে পারত না। পরম স্নেহ এবং সমাদরে লালিত কন্যার এ ধরনের জবাবে বিমুগ্ধ মাতা হযরত খাদিজা (রা.) তখন আল্লাহর দরবারে স্বীয় কন্যার জন্য বিশেষ দয়া প্রার্থনা করেন।

তিরমিযি শরিফ, মুস্তাদরাকে হাকেম দ্বিতীয় খণ্ডে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র বরাতে হযরত ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, দৈহিক গঠন, স্বভাব চরিত্র, আলাপ-আলোচনা, উঠাবসা প্রভৃতির মধ্যে হুজুর (দ.)'র সঙ্গে অধিকতর মিল হযরত ফাতিমা ব্যতীত অন্য কারো কাছে দেখিনি।” বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি শরিফে হযরত মিসওয়াল ইবনে মুখরামা (রা.)'র বর্ণনায় উল্লেখ আছে, “নিশ্চয় নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেছেন, “ফাতিমা (রা.) আমার শরীরের একটি টুকরা।” উপর্যুক্ত হাদিসের আলোকে দেখা যায় হযরত ফাতিমা (রা.) জন্মগতভাবে বিশ্বনবী (দ.)'র চরিত্র, স্বভাব এবং প্রকৃতিতে মহীয়ান এক বিরল প্রতিভাধর মহীয়সী রমনী। স্বীয় কন্যার প্রতি বিশ্বনবী (দ.)'র বিশেষ স্নেহজাত আকর্ষণ এবং সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে তিরমিযি শরিফ, মুস্তাদরাকে হাকেম দ্বিতীয় খণ্ডে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র বরাতে বর্ণিত আছে, “আর ফাতিমা (রা.) যখন হুজুর (দ.)'র দরবারে আসতেন তখন হুজুর (দ.) তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর কপালে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে মুহব্বত করে বসাতেন। যখন হুজুর (দ.) তাঁর নিকট যেতেন তখন ফাতিমা (রা.) হুজুর (দ.)'র তাজিমের জন্যে অত্যন্ত বিনম্র কায়দায় দাঁড়িয়ে যেতেন। হুজুর (দ.)'র অন্যকোন আওলাদ প্রসঙ্গে এ ধরনের বর্ণনা নেই। তাফসিরকারকদের দৃঢ় বিশ্বাস আওলাদে রাসূল (দ.)'র ধারা হযরত ফাতিমা (রা.)'র মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তশরিফ আনার বিষয়ে শুভ ইঙ্গিত এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যখায়েরুল উক্বা কিতাবে ইমাম তাবরানী হযরত সওবান (রা.)'র উদ্ধৃতি অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন, “বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) যে কোন সফরে যাবার সময়ে সর্বশেষ হযরত ফাতিমা (রা.)'র সঙ্গে দেখা করতেন এবং সফর থেকে

ফিরে আসা মাত্র সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা (রা.)'র সঙ্গে সাক্ষাত করতেন।” মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের তরফ থেকে হযরত ফাতিমা (রা.)'র প্রতি অসীম রহমতের অসংখ্য নমুনার একটি তাঁর সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একবার পবিত্র মদিনায় এক ধনাঢ্য ইহুদী ব্যক্তির কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে হযরত ফাতিমা (রা.) কে দাওয়াত প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক ইহুদীর আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত সকলে বিভ্রাট হওয়ায় সকলে দামি পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ধারণা ছিল অনুষ্ঠানে দাওয়াতপ্রাপ্ত ইসলামের নবী (দ.)'র কন্যা গরীবী হালতে কমদামী অথবা পুরনো পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হবেন—যা এক ধরনের উপহাস তুল্য হবে। স্বয়ং আল্লাহ্ ইহুদীবাদী রমনীদের এ ধরনের মজাক করার অভিলাষ হযরত জিবরাইল (আ.)'র মাধ্যমে অতি মূল্যবান অপূর্ব স্বাণ সমৃদ্ধ বেহেশতী পোশাক হযরত ফাতিমা (রা.)'র জন্যে প্রেরণ করে ইহুদী পরিকল্পনা নস্যাত করে দেন। অনুষ্ঠানের দিন হুজুর (দ.)'র সমীপে বেহেশত হতে পোশাক নিয়ে হযরত জিবরাইল (আ.) উপস্থিত হয়ে তা পরিধান করে ইহুদী কন্যার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হযরত ফাতিমা (রা.)'র প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা জ্ঞাত করেন। বিশ্বনবী (দ.)'র অনুমতিক্রমে হযরত ফাতিমা এদিন অত্যন্ত দামি বেহেশতী পোশাক পরিধান করে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। হযরত ফাতিমা (রা.)'র পরিধেয় বস্ত্র এবং চিত্তমোহনী খুশ্বেবের সম্মুখে ধনাঢ্য ইহুদী কন্যাদের পোশাক ছিল নিতান্তই অনাকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানে হযরত ফাতিমা (রা.)'র উপস্থিতির সৌরভে সকলে বিমোহিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, “হে নবী (দ.) নন্দিনী আপনি এতো নয়নাভিরাম রাজকীয় পোশাক কোথা থেকে পেয়েছেন? জবাবে হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, আমার আক্বা সৈয়্যদুল মুরসালীন থেকে পেয়েছি। তিনি এতো দামি পোশাক কোথা থেকে পেয়েছেন জানতে চাইলে হযরত ফাতিমা বলেন, বেহেশত থেকে হযরত জিবরাইল (আ.) এনে আমার পরিধানের জন্যে তাঁকে দিয়েছেন। আবদুর রহমান সফুরী কর্তৃক নানাহাতুল মাজালেজ কিতাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন এ অনুষ্ঠানে সমবেত অনেক মহিলা এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা জ্ঞাত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.)'র পৃথিবীতে স্বল্পকালীন অবস্থান এ ধরনের অফুরন্ত অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। বিশ্বনবী (দ.)'র প্রতি কাফিরদের নানামুখি ষড়যন্ত্র এবং দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও তিনি

অনেক সময় অলৌকিকভাবে তথ্য প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় মহান পিতাকে অবহিত করতেন। হযরত ফাতিমা (রা.) শৈশব থেকেই ছিলেন বিশ্বনবী (দ.)'র একান্ত সহযোগী। শুভ বিবাহের পূর্বে তিনি ঘর-সংসার বিরাগী আল্লাহ্ এবং রাসূল (দ.)'র প্রেমে সর্বস্বত্যাগী মসজিদে নববীতে সর্বদাই ইবাদতরত আসহাবে সুফফার সদস্যদের অল্প সংস্থানের বিষয়টি পুরোপুরি তদারক করতেন। নও মুসলিমদের বিভিন্ন অভাব এবং প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন 'জারিয়া' তথা আল্লাহুতা'আলার অনন্যা বন্দিনী, তিনি ছিলেন সর্বাধিক 'ক্বারিয়া' তথা পবিত্র কোরআন এবং আল্লাহু তা'আলা যিকির-আয্কার পাঠকারিণী। তাঁর ইবাদত সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রদান করেছেন। প্রিয়তম স্বামী হযরত আলী (রা.)'র সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকতো। হযরত আলী (রা.) কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। নবী (দ.) তনয়ার কোন ব্যক্তিগত দাসী ছিল না। বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (রা.) জঙ্গল থেকে কাঠ এনে, ধনীদের গৃহে কাঁধে করে পানি বহন করে অথবা কামলা হিসেবে মাঠে কাজ করে শ্রম নির্ভর জীবন যাপন করতেন। একই সঙ্গে রাসূল (দ.) তনয়া যাতায় গম পিষা, রুটি তৈরি করা, সন্তানদের পরিচর্যাসহ যাবতীয় গৃহকর্ম সম্পাদন করে পরিশ্রম করে সংসার পরিচালনা করতেন। এর মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তে ইবাদত এবং যিকিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র মুখ এবং অন্তর আল্লাহ্র যিকিরে এবং শোকরিয়া আদায়ের গোপন ইবাদতে ব্যস্ত থাকত। গভীর রাতে সকলে বিশ্রাম ও নিদ্রামগ্ন থাকলে তিনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। সকরুন মোনাজাতে তিনি কখনো ব্যক্তিগত আর্জি-অনুযোগ পেশ করতেন না, বরং উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণ কামনায় আল্লাহ্র দরবারে অশ্রুপাত করতেন।

বিশ্বনবী (দ.) কর্তৃক পৃথিবীবাসীর মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা.)'র মতো এতো বেশি পরমাত্মীয় জনিত স্নেহ অন্য কাউকেও প্রদর্শনের নজীর নেই। অথচ তাঁর এই পরম আদরের কন্যার সংসার জীবন ছিল সুকঠিন রিয়াজতের, তপস্যার এবং সারাঙ্কণ আরাধনা জনিত শোকরিয়া। রাসূল (দ.) দুহিতার সংসার সম্পর্কে সীরাত কারকগণ উল্লেখ করেছেন, অর্থ সংস্থানের জন্যে হযরত আলী (রা.) মশকে করে পানি ভরে বাড়ি বাড়ি দিতেন এবং সেভাবেই কিছু উপার্জন করতেন। আর হযরত ফাতিমা নিজের গৃহ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে

অন্যের গম পেশা কাজ করে কিছু উপার্জন করতেন। গম পিষতে গিয়ে তাঁর হাতের চামড়া ফেটে যেত। চুলার আগুনে রান্না করার কারণে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ত। অন্যদিকে পানি এবং কাঠ বহন করতে করতে হযরত আলী (রা.)'র বুকে প্রচণ্ড ব্যথা লাগত, কাঁধে দাগ পড়ে ঘা হয়ে যেত। এর মধ্যে ইবাদতের বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিরতি ছিল না। রাসূল (দ.)'র নিকট প্রিয়তমা কন্যার সংসার এবং কষ্টকর কালাতিপাতের সংবাদ পৌঁছে। কাজে সাহায্যের জন্য গণিমত থেকে একজন দাসী প্রদানের বিষয়টিও নবী করিম (দ.)'র নিকট পেশ করা হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকলের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) স্বীয় কন্যার পক্ষে আর্জি পেশকারীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, "মসজিদে নববীর পাথরের বেদীর ওপর কোন প্রত্যাশার হাত না বাড়িয়ে পরম ধৈর্য ধারণ করে যারা অনবরত আল্লাহ্র নাম উচ্চারণে নিমগ্ন তাদের প্রয়োজন সবার চেয়ে বেশি। তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে আমি আমার পরিজনের কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাব না।" এ ধরনের কষ্টসাধ্য এবং পরম ধৈর্যের মধ্যেই গড়ে ওঠেছে আহলে বাইতের তাসাওউফ জগত। বেলায়ত সম্রাটের পার্থিব জীবনের এ ধারার অনুকরণ এবং অনুশীলনে তাসাওউফের সূর্য পৃথিবীবাসীকে এখনো অনুরণিত করে চলেছে।

হযরত আলী (রা.)'র গৃহে পার্থিব সম্বল বলতে কিছু ছিল না। নিঃসম্বল হযরত আলী (রা.)'র দৈন্যতা সকলের নিকট জানা ছিল। নিয়মিত আহারের কোন প্রকার আয়োজন থাকত না। সামান্য খাদ্য-দ্রব্যও জমা থাকত না। কাজ পেলে পারিশ্রমিক হিসাবে উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে যৎসামান্য জোগাড় হতো তা দিয়ে খাবার তৈরি করে খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। আবার তাও প্রতিদিন হতো না। প্রায়শ তিন/চার বেলা উপোস থাকতে হতো। এ সময়কে তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রোজা পালনের নির্দেশ ধারণায় নিয়ে অতিবাহিত করতেন। তিন/চার বেলা উপোস থাকার পর কখনো খাবার জোগাড় হলে দেখা যেত গৃহের দরজায় বুভুক্ষুর করাঘাত। কখনো বিনম্র আকুতি, মুসাফির! কোথাও খাবার পাইনি। দয়া করে খাবার দিন। অভুক্ত হযরত ফাতিমা নিজের জন্যে রাখা রুটিটিও দিয়ে দিয়েছেন পরম সন্তুষ্ট চিত্তে। অনেক সময় দেখা গেছে খাবার নিয়ে দস্তার খানে বসেছেন, মুখে তুলে নেবেন, এ সময় উপোসী কারো ডাক; মা! খাবার দিন, কয়েক বেলা কিছুই খাইনি। হযরত ফাতিমা (রা.) শোকর গুজার করেই রুটিটি দিয়ে দিয়েছেন দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা ভিখারীকে। একদিনের ঘটনা। বনু সলিমের সর্বাধিক গরীব এক ব্যক্তি

বিশ্বনবী (দ.)'র সুমধুর ব্যবহারে তৃপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিঃসম্বল এ ব্যক্তির জন্য খাবারের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্নজনের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে অবশেষে নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.)'র দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়লেন হযরত সালমান ফারসী (রা.)। আওয়াজ পেয়ে হযরত সালমান ফারসী (রা.) পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “হে সত্য রাসূল (দ.)'র কন্যা! এই মিসকিনের খাবারের বন্দোবস্ত করুন।” উত্তরে হযরত ফাতিমা (রা.) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, “হে সালমান! আল্লাহর কসম। আজ আমরা তিনদিন না খেয়ে আছি। বাচ্চা দু'জন ভুখা অবস্থায় শুয়ে আছে। তবুও মিসকিনকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে নাই। আমার এই চাদর শামউন ইহুদীর নিকট নিয়ে যান এবং বলুন ফাতিমা (রা.) বিনতে রাসূল (দ.)'র এই চাদর রেখে গরীব মানুষকে কিছু খাবার দাও।” হযরত সালমান (রা.) লোকটিকে নিয়ে শামউন ইহুদীর কাছে গেলেন এবং তাকে সব কথা খুলে বললেন। বর্ণনা শুনে শামউন ইহুদী বললেন, হে সালমান! আল্লাহর কসম, এঁরা তাঁরা যাঁদের ব্যাপারে তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি ফাতিমা (রা.)'র পিতা (দ.)'র ওপর ঈমান এনেছি।” এরপর বললেন, ‘চাদর বন্ধক দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যত খুশি যব নিয়ে যান।’ চাদর ও যব নিয়ে হযরত সালমান ফারসী (রা.) ফাতিমা (রা.)'র গৃহে ফিরে এসে ঘটনার বর্ণনা দেন। সবশুনে নবী দুলালী ফাতিমাতুজ যাহরা (রা.) নিজ হাতে যব পিষে রুটি তৈরি করে লোকটিকে খাওয়ানোর জন্যে সালমান (রা.) কে দিয়ে দেন। সমস্ত রুটি দিয়ে দেয়ার কারণে সালমান (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.) সমীপে আরজ করে বাচ্চাদের জন্যে কিছু রেখে দিতে অনুরোধ জানান। জবাবে হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, “সালমান! যা আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার বাচ্চাদের জন্যে জায়েয নয়।” হযরত সালমান (রা.) সমস্ত রুটি নিয়ে হুজুর (দ.)'র দরবারে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। বিশ্বনবী (দ.) রুটিগুলো নও মুসলিমের হাতে তুলে দেন। আহলে বাইত হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, একবার একবেলা উপোসের পর আমাদের ভাগ্যে কিছু খাবার জোটে। আব্বাজান এবং আমাদের দু'ভাইয়ের খাওয়া শেষে মা খেতে বসবেন এমন সময় একজন ভিখারী দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, হে নবী দুলালী! আমি দু'বেলা অনাহারে আছি, আমার পেট ভরিয়ে দিন।’ যে গ্রাসটি মা মুখে তুলছিলেন, তা পুনরায় পাতের ওপর নামিয়ে বলেন, আমি শুধু একবেলা খাইনি, কিন্তু ঐ লোকটা দু'বেলা উপোস আছে। আমি [হাসান (রা.)]

খাবারগুলো ভিখারীর হাতে তুলে দিলাম। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর হযরত ফাতিমা (রা.)'র সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবন, যা তাসাওউফের বৈচিত্রময় কল্যাণমুখিতায় ভরপুর। হযরত ফাতিমা (রা.)'র এ ধরনের দানশীলতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আগাম ঘোষণা দেয়া আছে; “তাদের প্রয়োজন যত বেশিই হোকনা কেন তা থেকেই তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিকে খাবার দান করেন। (মনে মনে বলেন) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে এর কোন প্রতিদান চাই না, এমনকি কৃতজ্ঞতাও নয়”- (সূরা দাহর: ৭৬: ৮-৯)।

সিরিয়ার এক আমীরের কন্যার নাম ছিল ফাতিমা। দান খয়রাত এবং বদান্যতার জন্যে সিরিয়া দেশে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। দেশের প্রায় সকলে তাঁকে চিনতেন। এদিকে লোকমুখে তিনি বিশ্বনবী (দ.)'র প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)'র দান, খয়রাত এবং অতুলনীয় বদান্যতার খবর পেয়ে তাঁর ব্যাপারে জ্ঞাত হতে উৎসুক হন। তিনি আরো খবর পান যে গরিবী অবস্থায় কালতিপাত করা সত্ত্বেও দান খয়রাতের ব্যাপারে তিনি খুবই উদার। আর্থিক সংকটে থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে যখন কিছু আসে তা ভোগ না করে গরীব দুঃখী এবং মিসকিনকে তিনি তা অকাতরে বিলিয়ে দেন।

নামের মিল এবং উদার হস্তে দান করার সংবাদ পেয়ে আমীর কন্যা ফাতিমা'র মধ্যে এক ধরনের ইর্ষা দেখা দেয় হযরত ফাতিমা (রা.) বিনতে রাসূল (দ.) বিষয়ে। নবী দুলালীকে স্বচক্ষে দেখে এবং দান-দক্ষিণার ব্যাপারে অসীম উদারতা পরীক্ষার ইচ্ছে হয় আমীর কন্যার। আমীর কন্যা ফাতিমা পিতার অনুমতি নিয়ে প্রচুর মূল্যবান উপটোকন এবং দাস দাসী সহ হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.) সমীপে মদিনার পানে ছুটে আসেন। আমীর কন্যার ধারণা ছিল মূল্যবান উপটোকন এবং অনেক দাস দাসী সমেত তাঁর উপস্থিতিতে নবী কন্যা ঘাবড়ে যাবেন, বিমোহিত হবেন।

স্বাভাবিক আমীরী ধারণা নিয়ে অবশেষে আমীর কন্যা ফাতিমা নবী দুলালীর গৃহে উপস্থিত হন। হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে আন্তরিকতা সহকারে অভিবাদন জানিয়ে গৃহে প্রবেশ করালেও আনীত মূল্যবান উপটোকনের প্রতি তাঁর কোন প্রকার আকর্ষণ না দেখে আমীর কন্যা বিস্মিত হন। উপটোকন সমূহ হযরত ফাতিমা (রা.) খুবই স্বাভাবিক রীতিতে গ্রহণ করে গৃহ কোণে রেখে দেন। তিনি দ্রুত মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। ইতোমধ্যে এক ফাঁকে তিনি প্রতিবেশি গরীব, অনাথ, এতিম এবং অভাবী লোকজনকে তাঁর গৃহের সম্মুখে আসার

জন্মে সংবাদ দেন। আমীর কন্যার আনীত উপটোকনের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য এবং বস্ত্রসমূহ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেন। উপটোকন হিসেবে আনীত স্বর্ণ, মণি মুক্তা, হীরা জহরত তিনি আমীর কন্যার উপস্থিতিতেই বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দেন। দানের অতুলনীয় ঘটনা চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ করে আমীর কন্যা বিশ্বয়ে নবী দুলালীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। হযরত ফাতিমা (রা.) আমীর কন্যার বিশ্বয় বিমূঢ়তা লক্ষ্য করে বলেন, “দুঃখ করবেন না বোন, আপনি কিছু উপটোকন হিসেবে আমার জন্যে এনেছেন তা সানন্দে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছি। উপটোকন গ্রহণ করা মানে তা নিজে ভোগের জন্যে নয়। কারণ যে কোন অর্থ অথবা সম্পদের উপর মানুষের হক ততটুকুই যথার্থ, যতটুকু হলে সে মোটামুটি বেঁচে থাকবে। অর্থাৎ নিছক বাঁচার প্রয়োজন ব্যতীত কোন সম্পদের উপর মানুষের বাড়তি অধিকার নেই। আর অধিক সঞ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে অবৈধ। কারণ সম্পদের মালিক কখনো সঞ্চয়কারী হতে পারে না, বরং দেশের রিজ, নিঃস্ব, নিঃসম্বল জনগণের এতে পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামের আইন ও বিধান। তাই উদ্বৃত্ত সকল সম্পদে আল্লাহ যাদের অধিকারের কথা ঘোষণা দিয়েছেন, আমি তাদেরকে তা বিলিয়ে দিয়ে নিজের বোঝা হালকা করলাম। এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই।”

সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং হযরত ফাতিমা (রা.)’র কথা শুনে আমীর কন্যা ফাতিমা নিজ ভুল উপলব্ধি করে বলেন, “আপনি সৈয়দা! দোয়া করুন বাকী জীবন যেন আপনার পথই অনুসরণ করতে পারি।” অতপর বিদায় নিলেন আমীর কন্যা ফাতিমা। অভাব-অনটন-উপবাস হযরত ফাতিমা (রা.)’র পরিবারের নিত্য সঙ্গী। নিত্য দিনের একরূপ পরিস্থিতিতে একদিন নামায শেষে জায়নামায়ে আনমনা হয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে হঠাৎ সরওয়ারে কায়নাৎ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রিয়তম কন্যা সমীপে উপস্থিত হন। কন্যার চোখে অশ্রু এবং উদাসী অবস্থা দেখে রাসূল (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘মা তোমার এ অবস্থা কেন?’ হযরত ফাতিমা (রা.) জবাব দিলেন, “আমাদের অভাব-অনটনের কথা মনে পড়তে হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছি।” কন্যার মনোভাব অবহিত হয়ে হুজুর (দ.) হযরত ফাতিমা (রা.) কে বললেন, “ফাতিমা তোমার জায়নামাযের কোণা উল্টিয়ে দেখতো।” মহত্তম পিতার নির্দেশ অনুযায়ী জায়নামায উল্টিয়ে দেখতে পেলেন সোনা চাঁদি মনি মুক্তার দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যেন

আল্লাহপাক দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ জায়নামাযের নীচে এনে দিয়েছেন। হযরত ফাতিমা (রা.) মহান পিতার পবিত্রতম মুখের দিকে তাকালেন। অতপর স্বীয় প্রিয় কন্যাকে বললেন “যতো খুশি নিতে পারো, যতো খুশি কাজে লাগাতে পারো। ভোগ-বিলাস আর ঐশ্বর্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনকে কাটিয়ে দিতে পারো। সবই এখন তোমার এখতিয়ারভুক্ত। তবে মনে রাখবে, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকালের প্রাপ্তি বলতে মাটিও মিলবে না। এবার তোমার ইচ্ছে দুনিয়া নেবে, না আখিরাত নেবে?”

রাসূলে খোদা (দ.)’র কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন হযরত ফাতিমা (রা.)। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরজ করেন, “আব্বাজান! আমি আমার সাময়িক ভাবাবেগের ভুলের জন্যে অনুতপ্ত এবং তওবা করছি। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এ ধরনের ওয়াসওয়াসা আর মনে ঠাই নেবে না। দুনিয়ার ঐশ্বর্যে আমার কোন কাজ নেই।” এরপর তিনি জায়নামাযের কোণা ছেড়ে দেন।

হযরত ফাতিমা প্রায়শ অতি সাধারণ কাপড় পরিধান করতেন। অনেক সময় তালিযুক্ত উটের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাকও পরিধান করতেন। কোন কোন সময় পরিধানের কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা যেত না। এর মধ্যে একবার তার জন্যে নতুন কাপড় আনা হয়। এ কাপড়টি ব্যতীত বাকী কাপড় পুরানো ছেঁড়া, তালিযুক্ত। সেইদিনই এক মিসকিন মহিলা উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ভিক্ষা হিসেবে পরিধানের জন্যে বস্ত্র চায়। একটি পুরাতন বস্ত্র, অন্যটি নতুন জামা। তিনি তৎক্ষণাত নতুন বস্ত্রটিই মিসকিনকে দান করে দিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, দানের বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ, দান গ্রহীতাকে প্রিয় বস্ত্র দিয়ে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে দাতার দায়িত্ব।

ওফাতের দিন সকালে অসুস্থ অবস্থায় বিছানা থেকে উঠে ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি পরিবারের সকলের জন্যে রুটি তৈরি করে নিলেন। অসুস্থ অবস্থায় শেষবারের মতো নিজ হাতে প্রিয় সন্তানদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেন এবং বলেন এ কাজ হয়তো আর করা সম্ভব হবে না। অতপর গোসল সেরে ইবাদতে মশগুল থেকেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হযরত আসমা (রা.) কে বলে রাখলেন সন্তানদেরকে যেন খাইয়ে দেয়। এতো এক অভাবিত পরম দায়িত্ব সম্পন্ন মাতার তাসাওউফ জীবন।

হযরত ফাতিমা (রা.)’র শিশু কালেই কাবা প্রাঙ্গণে আবু জাহেলের অনুসারীরা সিজদারত বিশ্বনবী (দ.)’র কাঁধে উটের নাড়ি ভুড়ি তুলে দিয়ে হত্যার যে অপচেষ্টা করেছিল অসীম

সাহসিকা হয়ে দুর্বৃত্তদের বিদ্রোপতা উপেক্ষা করে নাড়িভুড়ি সরিয়ে ফেলে স্বীয় মহান পিতাকে শত্রুর নির্মম আচরণ থেকে উদ্ধার করেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ওহুদের যুদ্ধে আহত এবং রক্তাক্ত রাসূলে খোদা (দ.)'র সেবায় তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখেন তা সত্যের সপক্ষে রণক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে এক যুগান্তকারী ফয়সালা।

হযরত ফাতিমা (রা.)'র জীবন ছিল অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তদের মধ্যে অনন্য মর্যাদাময়ী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। এ কারণে তিনি আল্লাহর অপার করুণায় যথেষ্ট আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত পার্শ্ব জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে। এর সামান্য কিছু বর্ণনায় এনে তাঁর বেলায়তী ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সহজ হবে।

১. একবার তিনি এক ভিক্ষুককে চাওয়া মাত্র পবিত্র পিতার নিকট থেকে পাওয়া নতুন জামাটি দান করে দেন। তাঁর এ ধরনের অতুলনীয় পবিত্র মানসিকতায় সম্ভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাইল (আ.)'র মাধ্যমে হযরত ফাতিমা (রা.)'র জন্যে বেহেশতি জামা প্রেরণ করেন।

২. নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)'র সংসারে অভাব-অনটন ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অভাবের কারণে একবার ঈদের সময় সন্তানদের জন্য নতুন জামা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এদিকে প্রতিবেশি বাচ্চারা নতুন জামা কাপড় পেয়ে ইতোমধ্যে উল্লসিত হয়ে আছে। আহলে বাইতে রাসূল (দ.) হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বয়সে তখন ছোট। প্রতিবেশি বাচ্চাদের নতুন কাপড়ের আনন্দ দেখে তাঁর মা ফাতিমা যাহরা (রা.)'র নিকট নতুন জামার জন্যে বায়না ধরেন। হযরত ফাতিমা (রা.) প্রিয় সন্তানদ্বয়ের মন বুঝানোর জন্যে বললেন, “বাবা তোমাদের নতুন জামা এখনো তৈরি হয়নি।” এ ধরনের কথা দু’তিনবার বলার পরও সন্তানরা বার বার নতুন জামার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আসলে সে সময় বাচ্চাদের জন্যে শুধু নতুন কাপড় নয়, সামান্য উন্নতমানের খাবার তৈরি করার মতো অর্থও বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী-ফাতিমা (রা.)'র গৃহে ছিল না। কোন উপায়ান্তর না দেখে হযরত ফাতিমা (রা.) জায়নামায বিছিয়ে মহা মহান করুণাময় আল্লাহর দরবারে হাসনাইনদের (রা.) বিষয়টি অবহিত করেন। জায়নামাযে অবস্থানকালেই

হযরত জিবরাইল (আ.)'র মাধ্যমে আল্লাহপাক হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র জন্যে জান্নাতি পোশাক পাঠিয়ে দেন।

৩. একবার রাসূলে খোদা (দ.) দু’দিনের উপোস। তৃতীয় দিনে তিনি সামান্য খাদ্যের আশায় প্রিয় কন্যার গৃহে উপস্থিত হন বিশ্বনবী (দ.)'র ধারণা ছিল হয়তো কন্যার গৃহে কিছু না কিছু ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আল্লাহর মর্জি কন্যার গৃহে তিনদিন ধরে সবাই অভুক্ত। প্রিয়তম পিতার (দ.) চেহারায় উপোসের আলামত স্পষ্ট হয়ে আছে। হযরত ফাতিমা স্বীয় গৃহে বিশ্বনবী (দ.)'র আহ্বারের সামান্য ব্যবস্থা করতে না পেয়ে ব্যথিত হলেন। কন্যার অসহায়ত্ব দেখে নবী করিম (দ.) স্বীয় ছজরায় ফিরে যান। বিশ্বনবী (দ.)'র এভাবে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়া হযরত ফাতিমার মোটেও ভাল লাগেনি। তিনি দারুণ মনোবেদনায় পতিত হয়ে জায়নামাযে বসে পড়েন। তিনি আল্লাহর দরবারে কোন ফরিয়াদ দিতে পারছেন না, শুধু অব্বোরে কাঁদছেন, আর কাঁদছেন। হঠাৎ দেখা গেল এক অপরিচিত লোক কিছু রুটি এবং পাকানো গোশত রেখে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। রুটি এবং গোশত দেখে হযরত ফাতিমা (রা.) বুঝলেন, এটি রাহমানুর রাহিমের বিশেষ ফয়সালা। তিনি প্রিয় পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে ছজুর (দ.)'র খেদমতে প্রেরণ করে তাঁর সঙ্গে চলে আসতে খবর পাঠান। সংবাদ পেয়ে বিশ্বনবী (দ.) হযরত ফাতিমার (রা.) গৃহে দ্রুত আসেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) স্বীয় পবিত্র হস্তে পেয়ালার ঢাকনা খুলতেই দেখতে পান ভিতরে অনেকগুলো রুটি এবং প্রচুর পরিমাণে সদ্য পাকানো গোশত রয়েছে। রাসূলে খোদা (দ.) ঘটনার বিষয়বস্তু সহজে অনুমান করে কন্যার সঙ্গে এ বিষয়ে সামান্য মতবিনিময় করে সকলে এক সঙ্গে তৃপ্তিসহকারে খাবার শেষ করেন। তাঁদের খাবারের পরে অবশিষ্ট সব খাবার প্রতিবেশিদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

৪. আরেক দিনের ঘটনা। মওলা আলী (রা.) এদিন কোথাও কোন কাজ পাননি। কোন অর্থ কড়ি না থাকায় গৃহে খাবারের কোন আয়োজন হয়নি। এদিকে খাবারের জন্যে সন্তানরা মা ফাতিমা যাহরা (রা.)'র পানে বার বার ছুটে যাচ্ছেন। ক্ষুধায় কাতর সন্তানদের অবস্থা লক্ষ্য করে অবশেষে স্বীয় চাদর বন্ধক রেখে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে চাদরটি হযরত আলী (রা.)'র হস্তে তুলে দেন। এক ইহুদীর নিকট চাদরটি বন্ধক রেখে কিছু যব কিনে এনে তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত করে সন্তানদের খেতে দেন। এদিকে ইহুদী চাদরখানা সযত্নে একটি কক্ষে

রেখে দেন। রাতে ইহুদী পত্নী উক্ত গৃহে প্রবেশ করে লক্ষ্য করেন যে চাদরটি আলোতে বলমল করছে এবং চাদরের বিচ্ছুরিত আলোতে সমগ্র ঘরটি আলোকিত হয়ে আছে। ইহুদীপত্নী সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সবাইকে ডেকে তা দেখান। বিস্ময়ে বিমূঢ় ইহুদী পরিবারটি চাদরে অলৌকিক আলো দেখে বুঝে নেয়, নবী নন্দিনী হওয়ায় এটি হযরত ফাতিমা (রা.)'র ঐশী শক্তির নিদর্শন। ঘটনায় ইহুদী পরিবারটি সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কলেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান।

৫. সুনানে নাসাঈ শরিফের সংকলক ইমাম নাসাঈ (রহ.) উল্লেখ করেন, এক রাতে বিশেষ প্রয়োজনে হযরত ফাতিমা (রা.) গৃহ থেকে বাইরে আসেন। হঠাৎ রাসূল (দ.)'র একটি উট এসে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় সালাম জানিয়ে বলেন, আস্-সালামু আলাইকা ইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ (দ.)। এরপর উট বলে উঠে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার পিতার বাড়িতে? তাহলে আমার পিঠে আরোহন করুন। আমিও রাসূল (দ.)'র বাড়িতে যাচ্ছি। উটকে এ ধরনের কথা বলতে দেখে হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূল (দ.) বিস্মিত হন। তিনি আল্লাহর অপার করুণা দেখে অশ্রু বর্ষণ করে শোকরিয়া আদায় করেন। উটটি তাঁর নিকট এসে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে যায়। হযরত ফাতিমা (রা.) উটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই উটটি অমনি মাটিতে গুয়ে পড়ে এবং অল্পক্ষণ পরে মৃত্যু বরণ করে।

৬. মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আয়মান (রা.) উল্লেখ করেন, একদিন তিনি দুপুরে বিশেষ প্রয়োজনে হযরত ফাতিমার গৃহে গমন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, গৃহের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গৃহের অভ্যন্তরে যাঁতা ঘুরানোর শব্দ হচ্ছে। তিনি ফাঁক দিয়ে গৃহের ভিতরে কি হচ্ছে তা লক্ষ্য করে দেখলেন, (ক) হযরত ফাতিমা (রা.) ঘুমুচ্ছেন, (খ) অথচ তাঁর কাছেই আপনা আপনি যাঁতা ঘুরছে, (গ) হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র দোলনা নিজে নিজেই দুলাচ্ছে, (ঘ) হযরত ফাতিমা (রা.)'র পাশে বসে এক মহিলা তসবীহ পাঠ করছেন। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ঘটনাটি বিশ্বনবী (দ.) কে অবহিত করলে রাসূলে খোদা তাঁকে জানান, এ সময় তিনজন ফেরেশতা উপস্থিত থেকে হযরত ফাতিমা (রা.)'র কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন। এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে হযরত ফাতিমা (রা.) বার বার উল্লেখ করতেন, “সব আলামত এবং নিদর্শন একমাত্র মহান করুণাময় আল্লাহুতা'আলার।” বিশ্বনবী (দ.)'র সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রা.) সম্পর্ক ধারণাতীত

পরমতায় ভাস্বর। বুখারী এবং মুসলিম শরিফে উল্লেখ আছে, “ফাতিমা আমার দেহের অংশ। যে তাকে ক্রোধান্বিত করলো, সে যেন আমাকেই ক্রোধান্বিত করল।”

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রা.) কে একবার বিশ্বনবী (দ.)'র সবচেয়ে প্রিয়জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, “হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)।” উল্লেখ্য যে তাঁরা দু'জন বয়সে প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। একদিন কথোপকথনকালে হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে বলেন, “আমি আপনার চেয়ে অনেক উত্তম। কারণ আমি রাসূলে খোদা (দ.)'র পবিত্র এবং অতুলনীয় দেহের অংশ।” তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, “ফাতিমা! দুনিয়ার জীবনে সত্যিই তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তবে আখিরাতে যেহেতু আমি রাসূলে খোদার (দ.) সঙ্গে একত্রে বসবাস করব, সেখানে তুমি থাকবে না।” এ কথার পর হযরত ফাতিমা (রা.) নীরব হয়ে যান। তখন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)'র পবিত্র মস্তক স্বীয় কোলে তুলে নিয়ে বলেন, “ফাতিমা, বিশ্বাস করো, আমি যদি তোমার মাথার একটি চুল হয়েও জন্মগ্রহণ করতাম তা হলে খুবই সৌভাগ্যবান হতাম।”

বিশ্বনবী (দ.) বিয়ের পর হযরত ফাতিমা (রা.) কে যখন হযরত আলী (রা.)'র গৃহে প্রেরণ করেন তখন এ ঘরটি ছিল একটু দূরে। স্বীয় প্রিয় কন্যাকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টির আড়ালে রাখতে বিশ্বনবী (দ.)'র মন সায় দেয় নি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতিমার বাসগৃহ দ্রুত সময়ে বিশ্বনবী (দ.)'র হাজার সামনা সামনি একটি গৃহে ব্যবস্থা করা হয়।

আরেকবার গুণাহুগার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে বিশ্বনবী (দ.) সিজদারত অবস্থায় অনবরত কান্না করতে থাকেন। রাসূলে খোদা (দ.) এতোই আত্মহারা অবস্থায় ছিলেন যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মুক্তির আবেদন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ করেই চলেছেন। উপস্থিত সাহাবারা ঘটনা দেখে বিমর্ষ বিস্ময়ে হতবাক অবস্থায় তাঁকে সিজদা থেকে উঠানোর চেষ্টারত থাকেন। সাহাবীদের এতো করুণ আবেদন এবং আহাজারিতেও তিনি সিজদা থেকে পবিত্র মস্তক উত্তোলন করছেন না এবং তাঁর কান্নার আওয়াজও বন্ধ হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ এ ধরনের অবস্থা চলার পরেও যখন বিশ্বনবী (দ.)'র অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় নি, তখন উপস্থিত সকলে সমাধানের সুরাহা হিসেবে হযরত ফাতিমা (রা.)'র

দ্বারস্থ হন। বিশ্বনবী (দ.)'র অবস্থা সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা.) কে জানানো হলে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অতপর পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আপনি যেভাবে কান্নাকাটি করছেন এতে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ অচিরেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। আপনার সুপারিশে মহান আল্লাহ আপনার উম্মতকে অবশ্যই নাজাত দিবেন। যদি একান্ত তা না হয় আমি অঙ্গীকার করছি আমার হৃদয়ের টুকরা, চোখের মণি দুইপুত্র হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র বিনিময়ে হলেও আপনার উম্মতকে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছ থেকে মুক্ত করে নেব।” একথা বলে তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত মহান পিতার পবিত্র মস্তকে রাখা মাত্র বিশ্বনবী (দ.)'র চেতনা ফিরে আসে। এছাড়া বিশ্বনবী (দ.)'র বেসালকালীন বিশেষ ঘটনা যাতে একবার হযরত ফাতিমা (রা.) অঝোরে কান্না করলেন, আবার হাসলেন—এ সবই বিশ্বনবী (দ.)'র সঙ্গে তাঁর অনন্তকালব্যাপি ধারণাতীত সম্পর্কেরই বিষয়।

হযরত ফাতিমা (রা.) মহিলা হিসেবে শুধু নারী জাতির নন, তিনি বেলায়তের সম্রাজ্ঞী হিসেবেও তাসাওউফ সাধকদের সুমহান পথিকৃত। বেলায়তের রুশ্বা তাঁর অন্দর মহলেই বিদ্যমান আছে। তাঁর নির্বিলাস, নির্মোহ সাধনা রীতি এবং কষ্টসাধ্য পার্থিব জীবনেই আলোড়িত হয়েছে তাসাওউফ জগৎ। আহলে বাইত (দ.) হলেন সৃষ্টিজগতের সার্বিক কল্যাণ সাধনের এক অমূল্য অভিধান। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, “ওহে নবীর বংশধর! আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা হল যে, তিনি আপনাদের থেকে প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং আপনাদেরকে সর্বদিক দিয়ে পুতঃ পবিত্র রাখবেন”— (সূরা আহজাব : আয়াতাংশ : ৩৩)। হযরত ফাতিমা বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র বংশধর এবং সবধরনের পথকিলতামুক্ত পুতঃপবিত্র। আহলে বাইতের সদস্য বিধায় তিনি ‘ইহসান’র অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের সকল কাজ ‘ইহসানের’ আলোকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। হযরত ফাতিমা (রা.)'র জীবন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে, বেলায়ত আজলী বিষয়, আর তাসাওউফ হচ্ছে ব্যক্তিগত সাধনাসিদ্ধ জীবন ধারা। তবে ব্যষ্টিক এই জীবন ধারা সমাজ-সমষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

সুফি উদ্ধৃতি

- এখনই তওবা কর, এটাই সময়, আগামীকাল তওবা করবে এ খেলাল অনুচিত।
- আল্লাহুতায়লা হতে সৎকাজের সাহায্য প্রার্থনা কর, নফস এবং খাহেশাতের পিছনে কখনও চলোনা।
- যে ব্যক্তি অপবিত্র নফসের পিছনে ঘুরতে থাকে সে কখনও আল্লাহর নুর এবং সৎ রাস্তা দেখতে পায় না।
- নফস এবং খাহেশাতের মাথায় তলোয়ার নিক্ষেপ কর, যে ব্যক্তি নফস এবং খাহেশাতের পিছনে ঘুরে সে দ্বীনদার নয়।
- ফানায়ে নফস ব্যতীত নিষেধ কাজ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।
- নফসের বিনাশ এবং লতিফায়ে কুল্বেবের শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মশুদ্ধি সংঘটিত হয়।
- খাহেশাতে নাফসানীর অনুগতদের নিকট হতে ঈমানের স্বাদ তালাশ করো না।
- (জাহেরী শয়তানী এলমের) শত শত কিতাব ও শত শত পাতা আঙুনে নিক্ষেপ কর, নিজের মন ও প্রাণকে মাশুকের দিকে ধাবিত কর।
- তাকওয়া পূর্ণ পরহেজগারী এখতেয়ার কর, বেলায়ত ছাড়া পূর্ণ তাকওয়ার কোন সুরত নেই।
- প্রবৃত্তির বিনাশ এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার নামই তাকওয়া বা পরহেজগারী।
- তাকওয়া বা পরহেজগারীর সাথে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই।
- খুলুছিয়ত বা একাগ্রচিত্ত ব্যতীত ফরজ ওয়াজিব আদায় করলেও তাকওয়া বা পরহেজগারী অর্জন হবে না।
- আল্লাহকে ভয় কর, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে সে সফলতা লাভ করেছে।
- ফাসেদ খেলাল হতে অন্তরকে পবিত্র কর, আল্লাহপাকের ইশকের মহাসমুদ্রে ডুব দাও।
- রঙ্গরঙ্গে মত্ত হয়ে আর কতদিন কাটাবে? লোভ লালসার গলিতে আর কতকাল ঘুরাফেরা করবে?
- যার অন্তরে আল্লাহপাকের ইশক মহব্বত বিদ্যমান না থাকবে তার নিকট খোদায়ী রাজে আসরার কি করে প্রস্ফুটিত হবে?
- তুমি যদি সর্বদা গায়রুল্লাহ প্রতি আসক্ত থাক, তবে তোমার নিকট হতে আল্লাহর ইবাদত কিভাবে সঠিক হতে পারে?

— মুফতি-এ আযম, আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.)

গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)'র বাণী

“সৃষ্টি তিন প্রকার। ফেরেশতা, শয়তান এবং মানব। ফেরেশতা আপাদ মস্তক পবিত্র মঙ্গলময়। শয়তান আপাদ মস্তক অপবিত্র ও পাপী। মানব পাপ পুণ্যে মিলিত-মিশ্রিত। মানুষ পুণ্যের আধিক্যের জন্যে ফেরেশতাদের সঙ্গে মিলিত হয়। পাপ ও অন্যায় বেশি হলে শয়তানের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।” (ফতহুর রব্বানী ২য় খণ্ড)

“সম্পদ আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়। কারণ সম্পদশালী পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আল্লাহর আদেশ নিষেধের উপর নিজের প্রবৃত্তিকে স্থান দিয়ে থাকে।”

“মোমেন ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের বাদশাহ্। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর অনুজ্ঞ থাকেন, পাপ করা থেকে বিরত থাকেন। লোক সমাজ ও নির্জনতায় আল্লাহকে লা শরীক বলে বিশ্বাস করেন। দুনিয়াকে ঘৃণা করে তালাক দেন। দুনিয়া তার পিছনে পিছনে দৌড়ায়, আর বলে – বৎস! তোমার পানাহার গ্রহণ কর। মোমেন বান্দা তখন উত্তর দেন-পরকালের দ্বারে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার আহার গ্রহণ করব না।”

“আল্লাহ্ ওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর। তারা পাপে নিমজ্জিত এবং আযাবে লিপ্ত লোকদের প্রতি স্নেহশীল। এমন কোন বুজুর্গের সন্ধান পেলে তাঁর নিকটই পড়ে থাক। যদি এমন ব্যক্তির সন্ধান না পাও তবে তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে ক্রন্দন কর।”

“মারেফাত যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে স্থান লাভ করে তখন সে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও চিনতে পারে না। যেমন মৃত্যু আসার কারণে হুশ জ্ঞান বিলুপ্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও চিনতে পারে না।”

“জ্ঞানবান হও। জ্ঞানই দানশীল আল্লাহ্ চিনতে পারে। তুমি আল্লাহর দরবারে তোমার স্থানে সুদৃঢ় থাক। কেননা, তোমার জীবিকা সুনির্দিষ্ট-যা তার

নিকট এবং তাঁরই আয়ত্বাধীন। তাই টাকা পাওয়া এবং সম্মান লাভের লোভে ওয়াজ করায় কি লাভ?” “দুর্বল চিত্তের মোমেনকে ধন সম্পদ অলস, গর্বিত এবং আরাম প্রিয় করে দেয়।”

“নামকাম (নামের জন্য কাজ করা) লোকের নফসকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।”

“আল্লাহ্ ওয়ালাগণ যা কিছু করেন আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তাঁর সঙ্গেই করেন। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে বিস্ময়কর বিষয়বস্তু দেখান এবং তাঁর কর্ম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করান।”

“জুলুম দিনকে রাত, মুখমণ্ডল ও আমলনামাকে কালো করে দেয়। জুলুম করো না এবং জুলুমকারীকে সাহায্য করো না।”

“সম্ভব হলে ধৈর্যশীল উৎপীড়িত হও- অত্যাচারী হয়ো না। উৎপীড়িতের জন্য আল্লাহর সাহায্য সুনির্দিষ্ট, বিশেষ করে যখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকে না।”

“বান্দার দাসত্ব যখন আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হয়ে যায় তখন তার কোন কাজই তার নিকট অস্বস্তিকর মনে হয় না। কারণ আল্লাহ্ তখন তার কর্ম সমাধাকারী হন। আল্লাহ্ যখন কর্ম সমাধাকারী হন তখন তাকে অমুখাপেক্ষী করা হয় এবং সৃষ্টির নিকট হতে গোপন রাখা হয় যেন সৃষ্টির নিকট তাকে মুখাপেক্ষী হতে না হয়।”

“তাসাওউফ পথে ততক্ষণই কষ্ট উপলব্ধি হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার ইচ্ছা করে পথ অতিক্রম করতে থাক। আর যখনই তুমি তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখনই তোমার সফরের ক্লাস্তি এবং পথের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাঁর সাথে তোমার কল্বের প্রণয় হবে। অতপর এই প্রণয় আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এমন কি তোমার সমস্ত কল্বকে ঐশী প্রেমে ঢেকে রাখবে।”

আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াত এর চেতনা বিকাশের পথিকৃৎ হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (ক.) আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

এক.
বাংলাদেশের জমিনে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র তুরিকা বিশ্বসমাদৃত 'মাইজভাগুরীয়া তুরিকা'র প্রবর্তক, আওলাদে রাসূল (দ.), হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (১৮২৬-১৯০৬) কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৭৮০) হতে ১৮৫২ খৃস্টাব্দে সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী অর্জন করলেও ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই উক্ত মাদ্রাসায় মুদাররিস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। (মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ই.ফা., ২০০৪, পৃ.১১১) পরবর্তীতে তিনি যশোর জেলার কাজি বা বিচারক এবং কলিকাতার মুন্সি বো-আলী মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে কর্মরত থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রামে ফিরে এসে সামাজিকভাবে প্রচলিত প্রকাশ্য কর্মজীবনের ইতি টানেন। প্রকাশ্য কর্মজীবনের বড় অংশে পবিত্র কুরআন-হাদিস শিক্ষাদানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। এসময় তিনি অসংখ্য ছাত্রকে দ্বিনি ইলম শিক্ষাদান করেন যারা পরবর্তীতে মুফতি, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও আলেম হয়ে মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় অবস্থান কালে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝেও দ্বিনি ইলমের প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) প্রতি আরবি মাসের ২২ তারিখে ফরহাদাবাদ নিবাসী প্রখ্যাত আলেম, আশেকে রাসূল (দ.) হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম ফরহাদাবাদীকে (১৮২৫-১৯০০) মাইজভাগুর দরবার শরিফে দাওয়াত দিয়ে মিলাদ শ্রবণ করতেন। মিলাদ চলাকালে তিনি 'মারহাবা-মারহাবা' বলে ভাব-আবেগ প্রকাশ করতেন। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম ফরহাদাবাদী (র.) আরবি-ফার্সি ভাষায় মসনবির ধারায় 'নজ্মে দিল কুশা-ফি-মিলাদে মোস্তফা (দ.)' নামে ১৭০০টি হৃদয়গ্রাহী শ্লোক বিশিষ্ট একটি মিলাদ শরিফ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কেউ নিয়মিতভাবে অত্র অঞ্চলে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন ও সাধারণ মানুষকে হাবিবে খোদা রাসূলে খোদা (দ.) এর প্রেমে উজ্জীবিত করার আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি।

হযরত শাহ কারামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) পুত্র মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (১৮৩৪-১৮৯৯) যখন দরবারে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) খেদমতে

সাক্ষাতে আসেন তখন দেশবাসীরা মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাগুরীকে তাঁকে ওয়াজ করার জন্য অনুরোধ করতে আর্জি জানালে তিনি মাওলানা হাফেজ আহমদ জৈনপুরী সাহেবকে রাজি করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) অনুমতিক্রমে মাইজভাগুর দরবার শরিফের তথা বাংলাদেশের সুন্নিয়তের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিক বক্তার উপস্থিতিতে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করেন। এই মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.)। (জীবনী ও কেলামত, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ অত্র অঞ্চলে রাসূল (দ.) এর পবিত্র শান-আযমত বর্ণনা ও সুন্নিয়ত ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়াজ-মাহফিলের প্রচলন করেন গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.)।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) বিভিন্ন সময় ভক্ত-মুরিদগণের প্রশ্নের উত্তরে এবং বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে বর্তমান আলেমগণের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহে ফতোয়া প্রদান করে সহজ সমাধান দান করেন। যেমন- ১. ইলমে গায়েব এর মাসালায় তিনি বলেন- “যব কুন কাহা ছব হোগেয়া, ফের গায়েব কাঁহা হয়।” অর্থাৎ যখন (আল্লাহ) কুন বললেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সব হয়ে গেছে। তাহলে আর গায়েব কি রইল?

সিজদায়ে তাহিয়া বা সম্মানসূচক সিজদা সম্পর্কে তিনি বলেন- “পাঁচ আদমী কে লিয়ে সিজদায়ে তাহিয়া জায়েয হয়, কাজিখান ফতোয়া দেখ।” অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঁচ জনকে সিজদায়ে তাহিয়া করা জায়েয আছে। ফতোয়ায়ে কাজিখান দেখে নাও।

ঈদুল ফিতরের ফিতরা সম্পর্কে তিনি বলেন- “মিয়া যে দেশে যে খাদ্য প্রধান তাতেই ফিতরা দেওয়া যেতে পারে। তোমাদের প্রধান খাদ্য চাউল, তোমরা চাউল দিলেই ফিতরা আদায় হয়ে যাবে।”

ফাতেহাখানির বিষয়ে তিনি বলেন- “মিয়া ! আমার মাতা সাহেবানী ঘর দরজা পরিষ্কার করে লিপ দিতেন এবং ফাতেহা পড়িয়ে ঈসালে সাওয়াব করাতেন। মুরব্বিগণের প্রতি সাওয়াব পৌঁছাতেন। এটা ভালো।”

সামা মাহফিল সম্পর্কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) সম্মতির কথা জানা যায় তাঁর কর্মের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে তিনি কোন ভক্তকে ডেকে নির্দিষ্ট কালাম পরিবেশনের নির্দেশ দিতেন, মাঝে মাঝে ভক্তগণ তাঁর সামনে বসে বাদ্যযন্ত্র

সহকারে সামা পরিবেশন করতেন। আবার ভক্তগণের কেউ কোন হামদ, নাতে রাসূল (দ.), গজল শোনাতে চাইলেও তিনি অনুমতি দিতেন। (জীবনী ও কেলামত, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ) আবার গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর অনেক ভক্ত আশেককে দণ্ডরথানায় হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.) কাছে গিয়ে সামা মাহফিলে সমবেত হতে নির্দেশ দিতেন।

দুই.
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে দ্বিনি শিক্ষার প্রসার ও সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার মিশন 'মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা'। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর খলিফাগণের মধ্যে হযরত মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি, হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ, হযরত মাওলানা মিয়া হোসাইন, হযরত মাওলানা জাফর আহমদ প্রকাশ মামু ফকির, হযরত মাওলানা আলী আজম ও হযরত মাওলানা আবদুল করিমকে বার্মার (মায়ানমার) বিভিন্ন স্থানে এবং ছাদেকনগর নিবাসী হযরত মাওলানা আকরাম আলী শাহ প্রকাশ বাঙ্গালী বাবা ও হযরত মাওলানা মুহাযের জাফর আলী শাহ সাহাবাজকে পাকিস্তানে 'মাইজভাণ্ডারী তুরিকা' প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেন।

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী চরণদ্বিপি (১৮৫২-১৯২০) তাঁর খলিফাগণের মধ্যে হযরত মাওলানা আতহার আলী ফকিরকে বার্মায় (মায়ানমার) প্রেরণ করেন। হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ রাহে ভাণ্ডারী (১৮৪৮-১৯৬৮) তাঁর খলিফাগণের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউছুফ মম্চা শাহকে বেলজিয়াম, হযরত মাওলানা গোলাম মওলা শাহ ও হযরত মাওলানা আবু বক্কর শাহকে বার্মা, হযরত মাওলানা মোর্শেদ আলী কালন্দর শাহ (হায়দ্রাবাদ), হযরত মাওলানা আরকানী শাহ (কলিকাতা), হযরত মাওলানা হাদী শাহ (কলিকাতা), হযরত মাওলানা হাশেম শাহ (মুম্বাই), হযরত মাওলানা দাউদ শাহ (কলিকাতা) ও হযরত মাওলানা আবু বক্কর শাহকে (ত্রিপুরা) ভারতে প্রেরণ করে 'মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা' প্রচার ও প্রসারের কাজকে ত্বরান্বিত করেন। গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর আরেক খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক পানি শাহ (১৮৮২-১৯৫৭) তাঁর খলিফাগণের মধ্যে তাঁর নিজ ভাই হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক শাহকে বার্মায় তরিকতের দ্বিনি শিক্ষার প্রসার ও সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করেন।

এভাবেই দ্বিনি শিক্ষার প্রসার ও সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার মিশন 'মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা' প্রবর্তনের অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ভারত, বার্মা, পাকিস্তান তথা এই উপমহাদেশের সীমানা

পেরিয়ে সুদূর ইউরোপের বেলজিয়াম পর্যন্ত এই যুগোপযোগী তুরিকার দাওয়াত পৌছে যায়। পরবর্তীতে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা, তুরক, মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন দেশ সফর করে এই তরিকা ও সুন্নিয়ত প্রচার-প্রসারে কাজ করেছেন এবং বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী এই তরিকার লক্ষ লক্ষ অনুসারী সুন্নি জনতা আজ বর্তমান। আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছর আগেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী দ্বিনি শিক্ষার প্রসার ও সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন।

তিন.
হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী চরণদ্বিপি (১৮৫২-১৯২০) ১২৯৫ হি. সনে (১৮৭৮ খৃ.) কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় টাইটেল (কামিল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুরআন, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুল সহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। ১২৯৬ হি. সনে (১৮৭৯ খৃ.) তিনি প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তৎকালীন বিখ্যাত আলীগড় জামেউল উলুম মাদ্রাসার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি দুই বছর কুরআন-হাদিস শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকেন। দেশে ফিরেও তিনি ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে হেদায়তের আলো বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ রাহাতুল্লাহ শাহ নকশবন্দী (ইস্তিকাল ১৯৫৩) অত্র অঞ্চলে প্রথম সুন্নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি তাঁর সহপাঠী মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদ্রাসা 'মাদ্রাসা-এ-আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' (বর্তমান নাম জামেয়া নঈমীয়া, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯১০)-তে ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। দেশে ফিরে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাহাবী হযরত কাতাদাহ (রা.) এর নির্দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই মাদ্রাসা-এ তাওয়াক্কুলীয়া (যা ১৯৩৬ সালে নূরুল উলুম মাদ্রাসা নামকরণ করা হয়, বর্তমানে তা কামিল মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই উক্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সুন্নি মাদ্রাসা। এছাড়াও তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে- মকামে নকশবন্দীয়া (সূফিতত্ত্ব বিষয়ে), ফতওয়ায়ে তাওয়াক্কুলিয়া- ৭ খণ্ড (ফিকাহ-ফতোয়া বিষয়ে), দানিশ মানদী (যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে), খরদ মানদী (আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে), আকল মানদী (আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে), মাজমুয়ায়ে জায়ারিফ ওয়াল গারায়িব (হাদিস বিষয়ে), আল আহকামুল ইসতিহসান বি আয়াতিল কুরআন (কিছু মাসালা বিষয়ে)- অন্যতম। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফা আলা

হযরত, মুফতিয়ে আযম মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (১৮৬৬-১৯৪৪) ছিলেন বর্তমান সুন্নি আন্দোলনের রূপকার। তিনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে যোগ্য আলেম তৈরি ও লেখনির দ্বারা যুগোপযুগী দলিল ভিত্তিক স্থায়ী সমাধান প্রদানের মাধ্যমে সুন্নি মতাদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার কাজে সমানভাবে অবদান রাখেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ হলো-

১. ১৮৯২ সালে তিনি জীবনের প্রথম গ্রন্থ “গায়াতুত তাহকীক ফি মা ইয়াতায়াল্লাকু বিহি তালাকুত তা’লীক” (তালাক বা মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ এর সুস্বল্প বিশ্লেষণধর্মী ফতোয়া) রচনা।
২. ১৯০১ সালে “দাফিউস্ শোব্বাহত ফি জওয়াজিল ইস্তিজারে আলাত্ তোয়াআত” (ধর্মীয় কাজ করে বিনিময় নেওয়া প্রসঙ্গে সুস্বল্প-বিশ্লেষণধর্মী ফতোয়া) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ছিল আরবী ভাষায় রচিত। ভারতের কানপুরের ‘কাইয়ুমী’ প্রেস হতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
৩. ১৯০৪ মাইজভাগুরীয়া তুরিকার ইতিহাসে প্রথম কিতাব “তোহফাতুল আখইয়ার ফি দফই শারারাতিল আসরার” (নির্দোষ সামা, সিজদাহ তাহিয়্যাহ বা সম্মান সূচক সিজদাহ সহ বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত ফতোয়া) রচনা করেন। ১৯২২ সালে এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পুঁথি সাহিত্য সংস্করণ রচনা করা হয় ও কলিকাতা মোহাম্মদী প্রেস হতে তা মুদ্রণ ও প্রকাশ হয়।
৪. ১৯১৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোল্লা হাসানের কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মিরআতুল ফান ফি শরহে মোল্লা হাসান’ (ইসলামী আইন ও তর্ক শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ) গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ।
৫. ১৯২৮ সালে “শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফি তারদিদে মা-ফী-রাফি উল ইক্শালাত” (এটা ‘রাফিউল ইক্শালাত’ নামক গ্রন্থের খণ্ড) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন।
৬. ১৯৩৫ সালে “আত্ তওজিহাতুল বাহিয়্যাহ ফি তারদীদে মা-ফিত্ তানকিহাতিস্ সুন্নিয়াহ” (নির্দোষ সামা, সিজদাহ তাহিয়্যাহ বা সম্মান সূচক সিজদাহ সহ বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত ফতোয়া) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় রেফারেন্স বুক হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

৭. ১৯৪০ সালে জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ “রাফিউল গেশাবী ফি তারদীদে মা ফি ইশাআতিল ফতাবী” (এটা “ইশাআতিল ফতাবীল হানাফীয়াহ ফি তাহারিমি খোতবাতিল জুমুআ বেগাইরিল আরাবিয়্যাহ” গ্রন্থের খণ্ড) রচনা ও প্রকাশ করেন।
মাওলানা মুফতি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর (র.) কীর্তিমান অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং সুন্নি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন-
১. মমতাজুল মুহাদ্দেসিন মাওলানা ওবাইদুল আকবর, গোল্ড মেডালিস্ট, এম.পি.এ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২. ইমামে আহলে সুন্নত মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা (১৯০৬-১৯৬৯), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। ১৯৩২ সালে তিনি মেখল এমদাদুল উলুম আজিজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি হাটহাজারী জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, রাউজান ফতেহানগর অদুদিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা, রাঙ্গুনিয়া চন্দ্রঘোনা তৈয়বিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্রাসা এবং লালিয়ার হাট হামিদিয়া হুসাইনিয়া রাজ্জাকিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ওয়াজ-নসীহতের জন্য খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন। এছাড়াও তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে বাহাস-তর্কযুদ্ধও করতেন। তিনি একজন রাজনীতি সচেতন আলেম ছিলেন। তিনি নিজ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ‘জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম’ ও ‘আজ্জুমানে ইশা’আতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত, পূর্ব পাকিস্তান’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন কবি ও লেখক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ক ‘দেওয়ান-ই আজিজ’ (হামদ, না’ত ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের আউলিয়াগণের পরিচিতি ও প্রশংসা মূলক কবিতার গ্রন্থ। এটি তাঁর রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয়, পাঠকপ্রিয় ও আলোচিত গ্রন্থ), খ. ‘মাজমুয়াহ-ই ফাতাওয়া-ই আজিজিয়াহ’ (বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়ার সংকলন), গ. ‘ঈযাহুদ দালালাত’ (মুনাজাত বিষয়ে ফতোয়া) ইত্যাদি অন্যতম। (এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর জীবন ও কর্ম তুলে ধরা সম্ভব নয়)
৩. মাওলানা অলিউল্লাহ রাজাপুরী, কুমিল্লা।
৪. মাওলানা সৈয়দ আবদুল গফুর, প্রতিষ্ঠাতা- কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম সিনিয়র ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৫. মাওলানা মুফতি সৈয়দ রশিদ আহমদ, মির্জাপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৬. মাওলানা মমতাজুল হক বুলবুলে বাংলা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
৭. মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রতিষ্ঠাতা- ফরহাদাবাদ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৮. মাওলানা তোফায়েল আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা- নানুপুর গাউসিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. মাওলানা অধ্যক্ষ আবদুল হালিম, প্রতিষ্ঠাতা- নাজিরহাট আহমদিয়া মিল্লিয়া আলিয়া (এম.এ) মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. মাওলানা আবুল মোহাম্মদ শামসী, মুহাদ্দিস, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১১. মাওলানা মুফতি সিরাজুল হক আল কাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা- পেশকারহাট সিনিয়র ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা।
১২. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবুল বশর, সাবেক অধ্যক্ষ, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম সিনিয়র ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর নিকট হতে ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফাগণের মধ্যে শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা সৈয়দ ওবাইদুল মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুছাফা নঈমী (১৯১৪-১৯৯৩), মরিয়মনগর, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম-অন্যতম। তিনি প্রথম অত্র অঞ্চলে ১৯৫৭ সালে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর র্যালির আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে অনেক দ্বীনী শিক্ষা নিকেতন ও মসজিদ গড়ে উঠে। এদের মধ্যে- ক. রাঙ্গুনিয়া নূরুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা, খ. জামেয়া নঈমিয়া তৈয়বিয়া ফাজিল মাদ্রাসা (পোমরা), গ. মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা (পদুয়া), ঘ. আহমদিয়া তৈয়বিয়া রওশনীয়া দাখিল মাদ্রাসা (পারুয়া), ঙ. তৈয়বিয়া নূরীয়া সত্তারিয়া দাখিল মাদ্রাসা (শিলক), চ. রোয়াজার হাট জামে মসজিদ অন্যতম। এছাড়া তাঁর প্রদত্ত জমির অনুদানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে রাঙ্গুনিয়া নূরুল উলুম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাঙ্গুনিয়া প্রি-ক্যাডেট কিডার গার্টেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়- ক. জমিয়তে রজায়ে মোস্তফা (দ.), খ. আনজুমানে সাওয়াদে আজম এবং গ. আনজুমান-এ-এহইয়ায়ে সুনাহ্ বাংলাদেশ। “হুজুরে পাক (দ.) এর মর্যাদা” নামে তাঁর রচিত একটি গ্রন্থও রয়েছে। আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াত এর একদল অনুসারী বর্তমানে ভারতের বিখ্যাত আলেম, আশেকে রাসূল (দ.) ও অসংখ্য গ্রন্থ

প্রণেতা আল্লামা শাহ্ আহমদ রেজা খান ফাজেলে ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১) ব্যতীত অন্য আলেম-উলামাদের অবদান সম্পর্কে অনেকাংশে নীরব থাকেন। অথচ আল্লামা ফাজেলে ব্রেলভী (র.) মুফতিয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদীর একটি কিতাব পড়ে তাঁকে চিঠির মাধ্যমে বলেন, “আপনার কিতাব আমি দেখেছি। আপনার মত দক্ষ আলেম আমার গবেষণা কেন্দ্রে তথা কুতুবখানায় প্রয়োজন। আপনার সংসার চালাতে যা খরচ দরকার তা আমি দিব। আপনি সত্তর আমার এখানে চলে আসুন।” এই চিঠির উত্তরে আল্লামা ফরহাদাবাদী বলেছিলেন, “আমি গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর কুতুবখানায় আছি। আপনার কুতুবখানায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” [মাছ্দারু আনওয়ারিল বারী ফি তরজুমাতে গাউছিজ্ জমান আল্লামা ফরহাদাবাদী কাদ্দাছা ছিররুহুল বারী (আল্লামা ফরহাদাবাদী জীবনী), শাহ্জাদা মৌলভী ছৈয়দ লুৎফুল হক, প্রথম সংস্করণ- ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ খৃ., চট্টগ্রাম]

হযরত কেবলা মাইজভাগুরীর (ক.) খলিফা বাহরুল উলুম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবুল বারাকাত মুহাম্মদ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরি (১৮৬৪-১৯২৭) প্রথম মাইজভাগুরী সাহিত্য রচয়িতাগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত মোট ১৪টি গ্রন্থের (গদ্য ও পদ্য) সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত রচনা হলো-

‘আইনায়ে বারী ফি তরজুমাতে গাউসিল্লাহিল আযম মাইজভাগুরী’। এই গ্রন্থটি আরবি, উর্দু, ফার্সি ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রনে গদ্য-পদ্যে রচিত। প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি মাইজভাগুরী সাহিত্যের প্রথম রচনা যা লেখক স্বীয় মুর্শিদ হযরত কেবলা মাইজভাগুরীর (ক.) অনুমতিক্রমে লিখেন। এতে তিনি কুরআন-হাদিস, ইজমা-কিয়াস এর ভিত্তিতে তরিকতের সুক্ষ তত্ত্ব সমূহ উপস্থাপন করেছেন এবং স্বীয় মুর্শিদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। এটি বাংলাদেশে রচিত তাসাওউফ সাহিত্যের অতুলনীয় এক গ্রন্থ।

গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাগুরীর (ক.) ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা চন্দনাইশ সাতবাড়িয়া নিবাসী হযরত মাওলানা হাজী আবদুর রশিদ (১৮৭৪-১৯৫৪) কর্মজীবনে পিতার জমিদারী দেখাশুনা ছাড়াও পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪৫) হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পটিয়া-চন্দনাইশ এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় তাঁর সম্পত্তি নিজ আওলাদগণের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং ১৮১ শতক ভূমি ওয়াক্ফ করে ১৯৪৯ সালে ‘মাওলানা আবদুর রশিদ ওয়াক্ফ এস্টেট’ গঠন করেন, যা ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়। তিনিই ছিলেন এই ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রথম মোতোয়াল্লী। এই ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় হতে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা, তাঁর পারিবারিক কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতি বছর একটি ঈদে

মিলাদুন্নবী (দ.) মাহফিল এবং তাঁর বার্ষিক ফাতিহা-ঈসালে সাওয়াব মাহফিল করার জন্য ওয়াকফ দলীলে উল্লেখ করেন। এর পূর্বে বার্ষিক ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) মাহফিল করার জন্য অন্য কেউ ওয়াকফ করে সম্পত্তি রেখে গেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আরেক খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক পানি শাহ্ (১৮৮২-১৯৫৭)। তাঁর বিজ্ঞ পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল কাদেরীর তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম মোহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এছাড়াও তিনি হেকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি হেকিমী চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও, অবসর সময়ে তিনি নিয়মিত ছাত্রদের কুরআন-হাদিস শিক্ষা দিতেন এবং নিজ বাড়ির নিকটে বর্তমান মুহাম্মদ জামান চৌধুরী মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর পারিবারিক সেই মাদ্রাসার অনেক ছাত্র পরবর্তীতে দ্বীনি ইলম বিতরণে ভূমিকা রাখেন।

এভাবে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফাগণের বিবরণ দিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা সম্ভব। সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে এখানে সামান্য কিছু চিত্রন করা হলো মাত্র।

চর.

আওলাদে রাসূল (দ.), হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী (১৮৫৭-১৯৬১) ১৯৪১ সালে রেঙ্গুনের (বর্তমান মায়ানমারের তৎকালীন রাজধানী) দাওয়াতী মিশন শেষ করেন এবং ১৯৪২ সালে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে তরিকতের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেস ভবনে (নবাব সিরাজদৌলা রোড) খানকাহ স্থাপন করেন। তখন থেকে তিনি নিয়মিত চট্টগ্রাম আসা শুরু করেন। এখানে বসে তিনি চট্টগ্রামের মাটিতে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। এসময় তাঁর পাশে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ চট্টগামী প্রকাশ রাঙ্গুনিয়ার বুড়া হুজুর (র.) এবং আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেইনের বাসিন্দা শেখ বজলুর রহমান চৌধুরী (র.) অন্যতম। তাঁদের উভয়ের ভাষ্য মতে, হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী (র.) যখন একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হন তখন তিনি স্বপ্নে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) তরফ থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ যিয়ারতের ইশারা পান এবং তাঁর সাফল্যের ইঙ্গিত লাভ করেন। এই ইশারা লাভের পর

কালবিলম্ব না করে তিনি শিষ্যগণকে সাথে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ যিয়ারতে গমন করেন। নাজিরহাট (ঝংকার মোড়) গিয়ে তিনি গাড়ি থামান। সবাইকে গাড়ি থেকে নামার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আপনারা নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলুন, উভয় বুজুর্গ [হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.)] সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ে হেঁটে চলুন। তারপর নাজিরহাট থেকে বাকি রাস্তা তাঁরা পায়ে হেঁটে মাইজভাণ্ডার শরিফ গমন করে যিয়ারত সম্পন্ন করেন। এই যিয়ারতের পর ১৯৫৪ সালে স্থানীয় মুরিদগণের সহযোগিতায় এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর এলাকায় ‘জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা’র ভিত্তি স্থাপন করেন, যা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য এক অক্ষয় উপহার। (মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর ১৯৯৮ সংখ্যা, পৃ. ৪-৫)। ১৯৫৮ সালে তিনি শেষবারের মত চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত ‘আনজুমানে গুরায়ে রহমানিয়া’ এর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন ‘আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া’। তাঁর এই নামকরণের মধ্যেও অনেক রহস্য রয়েছে। অনেক মনে করেন এখানে ‘রহমানিয়া’ দ্বারা তাঁর পীর-মুর্শিদ ‘মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’-এর লেখক হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরতীকে (১৮৪৩-১৯২৩) উদ্দেশ্য করেছেন আর ‘আহমদিয়া’ দিয়ে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নাম উদ্দেশ্য করেছেন।

তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী, আওলাদে রাসূল (দ.), হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (১৯১৬-১৯৯৩) প্রথম চট্টগ্রামে আসেন ১৯৪২ সালে। সে বছর রমজান মাসে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে খতমে তারাবিহ নামাযের ইমামতি করেন। তিনিও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যিয়ারতে আসেন। যিয়ারতকালে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা মোবারক যিয়ারত শেষে বের হওয়ার সময় বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান এবং অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি করেন। ফেরার পথে তিনি মন্তব্য করেন, “শাহানশাহ্ বেশক্ শাহানশাহ্ হ্যায়।’ (প্রাণ্ডক্ত)

১৯৯৫ সালে ২১ ডিসেম্বর শ্রদ্ধাভাজন পিতার অনুসরণে আওলাদে রাসূল (দ.), হযরত আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ্ (ম.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যিয়ারত করেন। এসময় তাঁর সফর সঙ্গি ছিলেন মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী (র.), মাওলানা শাহ্ আলম নানুপুরী, আনজুমানের সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোহসিন সাহেব। স্থানীয়

আলেমগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী আজম, মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন মন্দাকিনী, মাওলানা নুরুল ইসলাম ফোরকানী, মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম, মাওলানা লোকমান হোসাইনী সাহেব। বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা যিয়ারতকালে তিনি তিনবার রওজা শরিফের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং শ্রদ্ধাভরে যিয়ারত করে মাওলানা নঈমী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে আবেগাপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'মাওলানা! এঁয়াহা আনেকী ছাথ ছাথ হামারা এক আরজু পুরা হোগায়া।' (মাওলানা সাহেব! এখানে আসার সাথে সাথে আমার একটা ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেছে)। রওজা শরীফের নকশা দেখে তিনি মন্তব্য করেন, "আজিব ইয়ে নকশাহ্। আল্লাহ্ তায়ালা জরুর তাকমিল ফরমায়ে।" (এই নকশা আশ্চর্যজনক। আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই এর পরিপূর্ণতা দেবেন) (প্রাণ্ডক্ত)

তিনি গাউসিয়া হক মনজিলের পরিদর্শন বইতে যে মন্তব্য লিখেন তার হুবহু অনুবাদ হলো- 'নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, অতঃপর, আমি নগন্য মাইজভাণ্ডার শরিফকে দেখলাম। মাযারে শায়িত প্রত্যেক সাহেবই এক একজন বেলায়তের শাহানশাহ্ এবং মাযার থেকে পরিপূর্ণ ফয়েজপ্রাপ্তি হয়। প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক মনোনিত এবং তাঁরা যা বলেন, তা অনায়াসে গৃহীত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেকেই যিয়ারতের সৌভাগ্য দিন। আমিন।'

বুজুর্গগণই অন্য বুজুর্গগণকে বুঝেন, সম্মান করতে জানেন। এই ধারাবাহিক যিয়ারতের ঘটনা হতে আমাদের কাছে এটা আবারো পরিষ্কার হয়ে গেল।

পাঁচ.

১৯৮০ সালে ২১ জানুয়ারী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মহানগরীর কলেজ রোডের দারুশ শেফা গলির খানকায়ে আসাদীয়া নূরীয়া সেহাবীয়া-তে। এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিলো ১১ জন। প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। সে সভার আহ্বায়ক ছিলেন আল্লামা শাহ্ আলাউদ্দিন এবং সভাপতি ছিলেন এই সংগঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা আহলা দরবার শরীফের আওলাদ, পীরে তরিকত আল্লামা সৈয়দ আবু জাফর মোহাম্মদ সেহাবউদ্দিন খালেদ আল কাদেরী আল চিশ্তী (র.)। (সুন্নি জাগরণের সূচনায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা, এম.এ.মতিন, ২০১০, ঢাকা)। পীরে তরিকত আল্লামা সৈয়দ এ.জেড.এম সেহাব উদ্দীন খালেদ আল কাদেরী আল চিশ্তী (র.) হলেন গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) খলিফা বোয়ালখালী আহলা দরবার শরীফের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা জনাব কাজী আসাদ আলী (ইত্তিকাল ১৯১৫) এর পৌত্র এবং গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত মাওলানা

শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) এর খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল মোকাররম নুরুল ইসলাম আল কাদেরী আল চিশ্তী প্রকাশ নূরী বাবা (র.) এর সুযোগ্য পুত্র।

হয়।

গাউসুল আযম হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফাগণের (যাঁদের নাম আমরা জানতে পেরেছি) মধ্যে অধিকাংশই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত আলেমে দ্বীন ছিলেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সোহবত, ফয়েজ লাভে ধন্য হয়ে তাঁরা এক এক জন উচ্চ স্তরের অলি-আল্লাহ্ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খনিতে পরিণত হন। সাধারণ মানুষ তাদের কাছ থেকে দ্বীন-দুনিয়ার জ্ঞান ও মহান আল্লাহ্‌র মারেফতের সঠিক জ্ঞানের সন্ধান লাভ করতো। আজ থেকে শত বছর পূর্বে তাঁরা যখন এই অঞ্চলের মানুষকে জাহেরী-বাতেনী ইলম শিক্ষা দিয়ে, খোদা ও নবী প্রেমের বীজ অন্তরে বপন করে দিয়ে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলোকে সমাজ গঠনের জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করছিলেন তখন অন্য কেউ ভিন্ন মতাবলম্বী বড় বড় আলেমদের সামনে যাওয়ার সাহসও করেনি। তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা মানুষের এতটাই আস্থাভাজন হয়ে উঠেন যে, তাঁদের কাছে মানুষ নিশ্চিন্তে গমন করেছেন। তাঁরা কখনো মানুষকে বিভ্রান্ত করেননি, তাঁরা মানুষকে সঠিক শিক্ষা দিতেন, কাউকে দ্বিধাশ্রিত করেননি, সত্যকে গোপন করেননি এবং তাঁরা কারো কাছে কোন বিনিময়ও চাননি। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা প্রচারের প্রাথমিক সময়ে তাঁরা অনেক বাঁধার সম্মুখীন হন। শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হন, লাঞ্ছিত হন, দারিদ্রতা বরণ করেন। কিন্তু গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে কখনো পিছপা হননি। যার ফলশ্রুতিতে শত বছর পর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, কক্সবাজারে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর জুলুসে লক্ষ লক্ষ আশেকে রাসূল (দ.) অংশগ্রহণ করছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আজ মিলাদ-কিয়াম, উরস, সামা, ফাতেহা, সিরাতুন্নবী (দ.) মাহফিল, উরসুন্নবী (দ.) মাহফিল, তুরিকত মাহফিল, পীর-মুরিদী ও খানকাহ্‌ ভিত্তিক আধ্যাত্মিক দীক্ষা বিতরণ, মাযার ও তুরিকত কেন্দ্রিক মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বিনা বাধায় পরিচালিত হচ্ছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আদর্শের খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে সমাজ গঠনের চেতনা যে হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরও নতুন প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন

সশ্রদ্ধ স্মরণ : অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.)

জাবেদ বিন আলম

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.) তাসাওউফ সাধনা এবং আচারিক ধারায় এক ব্যতিক্রমধর্মী সুফি ব্যক্তিত্ব। নিরাবরণ, নির্বিলাস সুফি জীবনে অভ্যস্ত এই সাধক পুরুষ সুফিতাকে কথামালার বর্ণিল ফল্পুধারার বর্ণনা সাজে না রেখে ব্যক্তিগত আচার, অভ্যস্ততা এবং সামাজিকতায় সাজিয়ে দিয়ে তাসাওউফ জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদান করেছেন। সাধারণভাবে লোক মহলে ধারণা আছে যে, সুফি মানে সমাজ বিচ্ছিন্ন, লোকাচার বিমুখ ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত কোন মহৎজন। এ ধরনের ধারণা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র আবির্ভাবের পূর্বে সমাজের গতি প্রবাহে যুক্ত থাকতে অনিচ্ছুক অথচ ভাবজগতে বিচরণ আকাঙ্ক্ষী পারলৌকিক চিন্তা মশগুল একশ্রেণির সাধকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সমাজ বিমুখ জীবন যাপন থেকে মূলতঃ ধর্মীয় জীবন এবং পার্থিব জীবনের মধ্যে এক ধরনের ভেদ রেখা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। উক্ত জীবন ধারার আলোকে সাধারণের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, ইসলামের সুফিবাদ অর্থ হয়তো জীবন বিমুখ অধ্যাত্ম বিষয়, যেখানে স্রষ্টা এবং সাধক ব্যতীত অন্য কিছুই সঙ্গে সম্পর্ক নেই। অথচ ইসলাম জীবনবাদী ধর্ম। ইহজাগতিক কর্মের ফলাফলের আলোকে পরকালীন সাফল্য-ব্যর্থতা নিহিত। পবিত্র কোরআনে ইহজাগতিক কর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কল্যাণময় কর্ম সম্পাদনে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইহজগতে কখনো আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতারণা, অসততা, অন্যায় অবিচার, কপটতা, ভণ্ডামি, জুলুমকে ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন দেয়নি। আল্লাহর অভিপ্রায়, কোরআনের নির্দেশনা, বিশ্বনবী (দ.)'র পার্থিব জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত নির্লোভ, নির্মোহ পবিত্র পার্থিবতাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সুফি জীবন। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী উপর্যুক্ত আভায় স্বীয় সুফি জীবনকে ভিন্নতর মানদণ্ডে উপস্থাপন করে প্রচলিত সুফি চর্চায় ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে নিজেকে স্বীকৃত করেছেন। এ কারণে একজন অনুশীলনকারী সুফি হয়েও তিনি পবিত্র সুফি সূত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কথিত সুফি চর্চার প্রকাশ্য সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। এটি মূলতঃ স্বীয় জীবন দর্শনের আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে আত্ম চিৎকারও বটে। প্রকৃত সুফিধারায় আত্মসমালোচনা আত্মশুদ্ধির জন্যে অতি প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে স্বীকৃত। গাউসুল আযম মাইজভাগুরী হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)'র নির্দেশিত ও

প্রবর্তিত কর্মপন্থা 'সপ্ত পদ্ধতি' অনুশীলনের আলোকে তিনি মানব চরিত্রের বিশুদ্ধতা অর্জনের তাগিদ দিয়েছেন। তাসাওউফ দর্শন এবং চিন্তাজগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান "বেলায়তে মোতলাকা"। এটি শুধুমাত্র তাসাওউফ ভিত্তিক গ্রন্থ নয়, বরং ইসলাম ধর্মের যুগোপযোগী ধারণা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত সারও বটে। বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের মাধ্যমে তাসাওউফ সম্পর্কে আচার সর্বস্ব ধর্ম পালনকারীদের বিরূপ মন্তব্য এবং কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোরআন, সুন্নাহ এবং বিশ্বখ্যাত মনীষীদের মতামতের আলোকে তাসাওউফের অত্যাবশ্যিকতা উপস্থাপন করে তাসাওউফ বিরোধীদের নেতিবাচক ধারণার যেমন জবাব দেয়া হয়েছে, তেমনি তাসাওউফপন্থীদেরকেও নিজেদের জীবন প্রবাহে কর্মাচার সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তাই বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থ সম্পর্কে গবেষক এবং তাসাওউফ সম্পর্কে ধারণা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরই জানার আহ্বান প্রবল। এই গ্রন্থে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী বিভিন্ন বর্ণনায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র বর্ণিত ইবনে মাজাহ শরিফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (র.) উল্লেখিত, "নিশ্চয় আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে প্রেরিত হয়েছি" হাদিসটির ধারণা স্পষ্ট করতে সচেষ্ট থেকেছেন। কারণ মানব চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের চেষ্টার নামই সুফিতা বা সুফি জীবন।

হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী'র পার্থিব জীবন অতি সাধারণ। তিনি নিজে রুজী রোজগার করতেন, অর্থাৎ কর্ম করে জীবন যাপনে সাচ্ছন্দ্য থাকতেন। অলসতা, অকর্মণ্যতা এবং পরজীবী স্বভাব তাঁর অপছন্দনীয় ছিল। জীবন ধারণের জন্যে তিনি ব্যবসাকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। এ ব্যাপারে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী'র প্রদৌহিত্র মরহুম রফিকুল আনোয়ার লিখিত হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (ক.)'র একমাত্র কন্যা "তোতা ময়না"র জীবনী পুস্তকের 'হযরত কেবলার কশ্ফে তাবির দেলা ময়না' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, "তাঁর সংসার চলতো বাড়ির ও রওজার মধ্যখানের মাঠের উত্তরে স্থাপিত একটি মুদি'কাম মনোহারি দোকানের আয় হতে। সমগ্র ফটিকছড়ি থানায় 'মিঞার দোকান' নামে এটি পরিচিত ছিল। দূর-দূরান্ত হতে লোক এসে ন্যায্য মূল্যে সঠিক মাপে সওদা নিতো। সুই সুতা থেকে রড সিমেন্ট পর্যন্ত গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই মিঞার দোকানে পাওয়া যেতো। মামা কখনো একবেলা কখনো দু'বেলাই দোকানের

ক্যাশে বসতেন। মামার চলাফেরা, পোশাক-আশাক ছিল খুবই সাধারণ। মাঝারি গড়ন, শ্যামলা গায়ের রঙ। ছোট করে চুল ছাটা, খুত্নিতে একগুচ্ছ দাড়ি পরিপাটি। মোটা কোরা কাপড়ের গোল গলা ফতুয়া, ফিকে রঙের চেক লুঙ্গি পড়তেন পায়ের গোড়ালির ওপর, পায়ে খড়ম বা চপ্পল। নামায বা তেলোয়াতের সময় সাদা টুপি। একেবারে চিরায়ত বাঙালি। অচেনা কাকেও নির্দেশ করে না দিলে চিনতে বা বুঝে উঠতে পারতো না, ইনিই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আউলিয়া মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (ক.) একমাত্র নাতি অছিয়ে গাউসুল আযম শাহজাদা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন। বশভূষার সঙ্গে সংগতি রেখে খাওয়া দাওয়া ছিল বাহুল্য বর্জিত। আমরা বেড়াতে গেলে মামা তাঁর ছজুরার পিছনের লম্বা একটা রুমে পাটি পেতে সবাইকে নিয়ে সকাল বিকেল চা-নাস্তা আর দুপুর রাত্রি খাবার খেতে বসতেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মামা খুবই রাজনীতি সচেতন। একাত্তরের মহা সংগ্রামে মামা দ্বিধাহীন চিন্তে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। ৭১ এর মে মাসের মধ্যবর্তী সময়ে একদল পাক হানাদার বাহিনী মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গিয়ে জুতা পায়ে দরগাহে প্রবেশ করেছে শুনে মামা অগ্নিশর্মা হয়ে হানাদারদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, অকুতোভয় মামার দেশপ্রেম ও পাঞ্জাবি হানাদারদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা দেখে উপস্থিত সবাই তখন ভয়ে কাঁপছিল এই ভেবে যে, পাঞ্জাবি দস্যুদের তো মাত্রাজ্ঞান বা কোন মানবিক মূল্যবোধ বেঁচে নেই, ওরা যদি শাহজাদা সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসে? বেলায়তের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখরে যাঁর অবস্থান, যিনি তাঁর নীরব সাধনার মধ্য দিয়ে স্বয়ং আল্লাহুতাল্লা থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁর সঙ্গে করবে পাঞ্জাবি বর্গিরা দুর্ব্যবহার? তিনি অকুতোভয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সুরে প্রথমে উর্দুতে পরে পাঞ্জাবি ভাষায় নাপাক লোকগুলোকে ঐ মুহূর্তে পবিত্র মাজার শরিফ ও দরগাহ প্রাঙ্গন ত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করলেন। বজ্রের মতো প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে পাঞ্জাবি দস্যুদের শরীর মন খরখর করে কেঁপে উঠলো। তারা উদ্যত সঙ্গীন রাইফেল নামিয়ে নতমুখে বিনাবাক্যে তড়িৎ মাজার শরিফ ত্যাগ করে এক রকম দৌড়েই ট্রাকে উঠে পালিয়ে গেলো। শ্বাসরুদ্ধকর ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে সেদিন উপস্থিত জনতা বুঝতে পারল, মাঝারি মাপের অতি সাধারণ সাজ-পোশাকের মধ্যে শুধু একজন হযরত কেবলার নাতিই লুকিয়ে নেই, আজ যা দেখা গেলো— মনে হলো শাহজাদার হাতে যেন মুসা নবীর সেই অতি সাধারণ ছড়ি; যার বিশ্ব শাসনের অপার ক্ষমতা। সেই প্রথম শাহজাদা সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের আপোষহীন দেশপ্রেমের সঙ্গে বেলায়তের জ্বালামুখ দৃশ্যমান হলো।

তিনি নির্বিকার, তাঁর সাধারণ অবয়বে। কোন মোসাহেবই

সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের আধ্যাত্মিক শক্তির এই ঝলোয়াতে কোনভাবেই ব্যবহারের সুযোগ পেল না। তাঁর ব্যক্তিত্বই এমন ছিল যে, তাঁর কাছে তোষামোদ, খোশামোদ বা বুজুর্গী ছিল অচল। তিনি খোলাফায়ে রাশেদার আদলে জীবন চালিত করতেন। ইসলামের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় দিক সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনার গভীরতা বড় বড় ধর্ম তত্ত্ববিদকেও হতচকিত করে দিতো। তিনি ইসলামী মর্মবাদ তথা সুফিবাদ অচিন্ত্য আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর আদিষ্ট মৌলিক বিধান সমূহের গভীর জ্ঞানের অধিকারী পরিকীর্তিত ব্যাখ্যাদাতা ও মহান দার্শনিক। তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাদাতা ও নতুন চেতনার উন্মোচকারী। তাঁর ‘বেলায়তে মোতলাকা’ এক অসাধারণ ধর্ম দর্শন ও আত্ম দর্পন। এ ধরনের বই খুব বিরল। যে কোন শিক্ষিত লোক এ গ্রন্থ পাঠ করে সম্পূর্ণ বদলে যাবেন।” সংক্ষিপ্তসারে জনাব রফিকুল আনোয়ার অতি কাছে থেকে দেখা তাঁর মামাকে নিজস্ব রচনা শৈলীতে এঁকে এনেছেন। একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের বিশুদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার জন্যে এ ধরনের সুন্দর বাক্যচিত্র ভাবাবেগ বর্জিত এবং যথার্থ।

হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কিশোর বয়সে পিতৃহারা হন। প্রাক ইসলামী যুগে পিতৃ মাতৃহীন শিশু-কিশোরের প্রতি এক ধরনের কুসংস্কার লালিত হতো। সাধারণত সমাজের বিত্ত সম্পদশালী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থে এ ধরনের কুধারণা প্রচার করে পিতৃ-মাতৃহীন শিশু-কিশোরদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের রেওয়াজ চালু রাখত। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ধারণা পোষণকে সুস্পষ্টভাবে বারণ করে এতিমের প্রতি পরম মমতা প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার এবং সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) ছিলেন আল্লাহর নির্দেশনার পাশাপাশি বিশ্বনবী (দ.)’র শৈশবকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল সুমহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। সমাজের এক শ্রেণির নোংরা মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের খাসলাত সম্পর্কে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর তিনি সবসময় তাঁর পৌত্র সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে স্বীয় গদিতে পাশে বসিয়ে রেখে পৌত্রের বুনয়াদী মর্যাদা পাড়া-প্রতিবেশী, খলিফা, ভক্ত-মুরিদ সহ জনসাধারণের নিকট স্পষ্ট করে দেন। ভবিষ্যতে কেউ যেন তাঁর অছি এবং একমাত্র উত্তরাধিকারীর পদ মর্যাদা, সম্মান বিষয়ে অবজ্ঞা, অবহেলা প্রদর্শন না করে তার জন্যেই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ্যে এ ধরনের এত্তেজাম করতেন। তাঁর পৌত্রের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক প্রকাশ্য উক্তি মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে এখনো প্রচারিত আছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (দ.)'র শৈশবস্থার ঘটনাকে শিক্ষণীয় অনুশীলন হিসেবে ধারণায় নেয়া যায়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই বিশ্বনবী (দ.) পিতাহারা হন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মাতাও একমাত্র শিশু সন্তানকে পৃথিবীতে রেখে পরপারে পাড়ি জমান। সে সময় দাদা আবুদল মোতালিব ছিলেন কুরাইশ সর্দার এবং পবিত্র কাবা গৃহের সেবায়ত ও তদারককারী। আরবের বাইরেও তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও মর্যাদা বিদ্যমান। মক্কার সকলে বংশীয় আভিজাত্য, সততা, সদাচার, দানশীলতা, অতিথি পরায়ণতার কারণে তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান করত। আরবের বাইরে তিনি 'মুকুটহীন সম্রাট' নামে সম্মানিত হতেন। পিতৃ-মাতৃহীন সন্তান সম্পর্কে একশ্রেণির মানুষের কুসংস্কার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন। তিনি যখন কাবা গৃহের সামনে প্রতিদিন লোক সমাবেশে হাজির হতেন তখন তাঁর বসার মর্যাদাপূর্ণ আসন হিসেবে বিশেষ ফরাশ বিছানো হতো। ফরাশে বসার সময় তিনি তাঁর প্রিয়তম পৌত্র 'মুহাম্মদ' কে পাশে বসিয়ে রাখতেন। এ ব্যবস্থার সামাজিক কারণ ছিল যাতে কেউ ভবিষ্যতে এই অনাথ বালককে অবজ্ঞা করে তাঁর গোত্রীয় অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। বিশ্বনবী (দ.)'র বেচালকালে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)। মাতৃহীন কন্যাকে তিনি এতোই স্নেহ করতেন যে কোন কোন সময় নিজের জায়গায় বসাতেন, যাতে সকলে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। বিশ্বনবী (দ.)'র উপর্যুক্ত ধারা অনুশীলন করে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী তাঁর স্বীয় একমাত্র কন্যাসহ সর্ব মহলকে তাঁর উত্তরাধিকারী বিষয়ে সতর্ক রেখেছিলেন।

গাউসুল আযম মাইজভাগুরী'র দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর মর্যাদা এবং আভিজাত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী কেবলা আলম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন (রহ.) কে স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপন মুর্শিদের পৌত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। পূর্বাপর সবকিছু অবহিত থেকেই বাবা ভাগুরী গাউসুল আযম মাইজভাগুরী'র একমাত্র কন্যা তোতা ময়নার প্রথম কন্যা সৈয়দা সুলতানা বেগম'র সঙ্গে স্বীয় বড় শাহজাদার শাদী মোবারক নিজ পছন্দানুযায়ী অতি সানন্দে সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) তাঁর কন্যা তোতা ময়নাকে এতো ভালবাসতেন যে বক্তৃপুর নিবাসী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আশরাফ সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার সময় একটি শর্ত প্রদান করেছিলেন। শর্তটি ছিল বিয়ের পর তাঁর কন্যা পিতৃ গৃহে তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবেন। তোতা ময়নার স্বামীও মাইজভাগুর দরবার শরিফে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করবেন এবং তোতা ময়না

সময় সময় শ্বশুর বাড়িতে যাবেন। এ ধরনের শর্ত মেনে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর যখন তোতা ময়না শ্বশুর বাড়িতে যেতেন, তখন একই সঙ্গে ভিন্ন পালকীতে করে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীও কন্যার শ্বশুরালয়ে গিয়ে অবস্থান করতেন। কন্যা শ্বশুর বাড়ি থেকে পিত্রালয়ে ফিরে আসার সময় গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.)ও কন্যার সঙ্গে মাইজভাগুর শরিফে ফিরে আসতেন। এ ধরনের ঘটনায় কন্যার প্রতি মমত্ব এবং কন্যার মর্যাদা সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী এবং তাঁর উত্তরাধিকারদের মর্যাদা বার বার স্বীকৃত হয়েছে।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.) নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেন। কখনো বংশীয় আভিজাত্য, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ করতেন না। তাঁর স্বভাবজাত বিনম্র আচরণ এবং বেশভূষায় তা প্রকাশও পেত না। তাই তিনি খাদেমুল ফোকারা তথা ফকিরদের খাদেম লকবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। পৃথিবীতে ৮৯ বছরের জীবন যাপন কালে অনাড়ম্বরতা যেমন তাঁর পছন্দ ছিল, অনুরূপ কোলাহল-কলোরব মুখর কর্মময় পার্থিব জগত থেকে বিদায় গ্রহণকালেও তাঁর বাসনা থেকেছে নান্দনিক সৌধ সম্বলিত মাজারের পরিবর্তে আকাশের সামিয়ানা, সূর্যের আলো আর চাঁদের স্নিগ্ধতায় ভরপুর দুবলাঘাসের নীচে চিরস্থায়ী অকৃত্রিম প্রাকৃতিক আবাসন। আল্লাহ তাঁর মর্জি কবুল করেছেন। সমগ্র জীবনে কখনো তিনি তাঁর আজমত প্রকাশ করেন নি। তাঁর জীবনধারা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, শাকীল বদায়ুনী'র বিখ্যাত কালামে, "মাই গোলামে মোস্তফা হোঁ, মেরি আযমতেনে না পুছো, মেরা দিল বানা হে কাবা, অওর জিগর বানা মদিনা"— অর্থাৎ আমার অবস্থান জানতে চেয়ো না, আমি মোস্তফার গোলাম, এটিই জেনে রেখো, আমার অন্তরকে কাবা বানিয়ে দাও এবং কলিজাকে পরিণত করো মদিনায়।" এ ধরনের ফরিয়াদের আলোক হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী সার্বিক অর্থে সংযত জীবনাচারের এমনই এক বিরল উপমা যিনি স্বীয় আজমতকে বরাবরই লুকায়িত রেখে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর মনোনীত খাদেমের উর্ধ্বে নিজেকে পরিচয় দিতে চান নি। তিনি নির্বিলাস অবস্থায় পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন পরম সততা, কর্মনিষ্ঠা, বৈরি অবস্থা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে ধৈর্য ও অসীম সাহসিকতা নিয়ে। তাই তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে মর্মস্পর্শী বাক্য দিয়ে "হযরতের তোতা ময়নার" দৌহিত্র জনাব রফিকুল আনোয়ার লিখেছেন, "তিনি (সৈয়দ দেলাওর হোসাইন) এক মহাজ্ঞানী মুসলমান, বাল্যে পিতৃহারা ও কৈশোরের শুরুতেই আউলিয়া দাদাজানকে হারিয়ে দেলা ময়না পথ হারান নি।"

চির দীপ্যমান শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

শওকত হাফিজ খান রুশ্নি

[জনাব শওকত হাফিজ খান রুশ্নি, ১৯৭১'র রণাঙ্গনের খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধা, কবি, প্রবাসিক, বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের কারা নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক এবং সংগঠক। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামের রাউজানে। পিতা হাফিজুর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। চট্টগ্রাম মহানগরীর ঘাটফরহাদবেগে তাঁর পিত্রালয়। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষ ভাগে কারাগারে বন্দী থাকাকালেই বিরল স্বপ্ন দেখে তাঁর মনোজগতে বিরাট পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক ভাবাবেগ ত্যাগ করে সরকারি কর্মপদে যোগদানের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত আয়-উপার্জন মানসে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এ সময়ে আধ্যাত্মিক কাব্য-কবিতার প্রতি তাঁর দারুণ আসক্তি জন্মে। দ্রুত যোগসূত্র পেয়ে যান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পদ পরশে গমন করে। কবি-লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি অনেক পূর্বে, ছাত্রাবস্থায়, ভিন্ন অঙ্গনে। কিন্তু শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জ্যোতির ঝলকে হারিয়ে যায় অন্যসব ভিন্ন অঙ্গন। দ্রুত তিনি একাত্ম হয়ে যান মাইজভাণ্ডার কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং কাব্য রচনায়। ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ নূরুল বখতিয়ার শাহ্ সাহেবের সঙ্গে। ভূমিকা রাখেন আলোকধারাসহ মাইজভাণ্ডারী চিন্তা ও দর্শন ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনার সঙ্গে। জনাব শওকত হাফিজ খান রুশ্নি বর্তমানে আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু কর্মের কারণে তিনি বিভিন্নভাবে আমাদের মধ্যে জেগে আছেন এখনো। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৯৩ তম খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে তাঁর একটি লিখা পুনঃপ্রকাশ করা হলো।] —সম্পাদক

নিদ আয়ে তো খোয়াব আয়ে, খোয়াব আয়ে তো তুম আয়ে,
ফের তোমহারি ইয়াদ মে-না নিদ আয়ে, না খোয়াব আয়ে।
অনুবাদঃ ঘুম এলেই স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন এলেই তুমি আসো। কিন্তু
যেই তুমি আসো তখন না আসে ঘুম না আসে স্বপ্ন। - ফিরাক
গোরখপুরী।

১। চিরদীপ্যমান শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
অনিঃশেষ উৎস হতে অফুরান পবিত্রতার অভিজ্ঞান। এ
পবিত্রতা নিষ্কামমোহ প্রেমের উজ্জ্বলতায় মগ্ন চৈতন্যের
ঐশ্বরিক একাত্মতার অভিষেকে অনিবার্যতায় ভাস্বর।
লৌকিক-পারলৌকিক সকল সান্নিধ্য ও স্পর্শে সকল অভিব্যক্তি
ও ব্যঞ্জনা শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
নশ্বর-অবিনশ্বর সকল প্রেক্ষাপটে ঐশী প্রেমে লিও টলস্টয়ের
ভাষায় 'জীবন ভোলা মোমবাতির মতো জ্বলজ্বলে' তিমির
হননের ধ্রুব সত্যে একজন প্রেমের মহাজন রূপে চিরদিন
চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। অযুত আর্ত মানবাত্মা এ মহাজনের
ভাণ্ডার হতে গ্রহণ করেছে অনেক অনেক প্রদীপ্ত জীবন সঞ্জীবনী

সুখা। আলোকিত করেছে অগণন মানুষ স্বীয় অন্ধকার
আত্মাকে। জাগ্রত করেছে স্বীয় সুপ্ত অভীষ্টাকে। শানিত
करेছে স্বীয় বিবেচনার অনুভবকে। এক কথায় অকাতরে
বিলিয়েছেন এ মহাপুরুষ অহর্নিশ অবিরাম আপন প্রেমের
মহিমা ও সৌন্দর্যকে। অসম্ভব অসাধারণতায় জনারণ্যে
নিজেকে বিলিয়ে দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিলো না এতটুকু। সময়ের
অনন্ত পরিধিব্যাপী তাই বিস্তৃত ছিলো তার কর্মের দ্যোতিময়
কৃতিমানতা।

কবি ইকবালের ভাষায়, 'গুলজারে হস্ত ও বুদ নতু বেগানওয়ার
দেখনে কি চাঁজ হ্যায় ইসে তু বার বার দেখ, অর্থাৎ আছে এবং
ছিলোর বাগানকে উদাসীন চোখে দেখোনা। দেখবার জিনিস
এটা, বার বার চেয়ে দেখ। শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (ক.)ও তাই কাউকে, কোন কিছুকে উদাসীন
চোখে দেখেননি। সবাইকে সব কিছুকে তিনি দেখেছেন গভীর
অন্তর্দৃষ্টির পবিত্রতায়। গালিবের মতো বুঝি তাই তিনি "জান
দি দি ছয়ি উসীকি থি অর্থাৎ যে প্রাণ দিলাম সে তাহারী-দান-এ

তত্ত্বে নিরন্তর চালিয়ে যেতেন, ছড়িয়ে দিতেন মহান স্রষ্টার কাছ হতে পাওয়া আলোর উৎস, স্রষ্টার কাছ হতে পাওয়া আলোর উৎস ভাণ্ডার।

২. মাইজভাণ্ডারী সাধন পথের চাঞ্চল্যময় কর্ম প্রবাহের বেগবান ধারার প্রতিভু শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। মাইজভাণ্ডারী দার্শনিক প্রজ্ঞার বিস্ময় ও চমৎকৃত বিশিষ্টতার শিরোনাম হলেন শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। অলৌকিকত্বে নয় বরং জাগতিক জীবনধারায় মানবিক শ্রেষ্ঠত্বকে প্রনিধানযোগ্য করে তিনি হয়েছেন বহমান ঐশ্বরিক ধারার হিরন্ময় অধীশ্বর।

তাই তিনি আচারকে ভাঙ্গলেন প্রেমের নিষ্ঠায়। আচার বিভক্ত অর্গলকে ভেঙ্গে মানবিক ধারায় স্থাপনা দিলেন প্রেমের ঐকান্তিক সাম্যকে। ফলে প্রেমের পথে যারা গেলেন তারা পেলেন তাঁকে পাছ জনের সখা হিসেবে। সে জন্য প্রেম কাননের মৌ বনে শায়েরের আকুল-ব্যাকুল কণ্ঠে পাগল পারা সুর মুর্ছনা জাগে।

‘কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়ে হরিলে আমারি প্রাণ।’ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রেক্ষিত ও অধিষ্ঠানকে তিনি নিয়ে গেছেন আরো উদার আরো ব্যাপক প্রেক্ষাপটে। তিনি দেখেছেন মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে, সম্প্রদায়কে নয়। পশু পাখী জীবজন্তু ইত্যাদিকে তিনি স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্যের উদারতায় আকীর্ণ করে নিয়েছিলেন। পাহাড় নদী, বিশেষ করে সমুদ্রকে তিনি অনন্ত অসীম প্রেমময়ে নিয়েছিলেন। সে কারণে তাঁর অতি প্রিয় শান্তি ও স্বস্তির স্থান ছিল সমুদ্র সৈকত, সাগরের উর্মিমালা। কল্লোলিত সমুদ্রের ধ্বনিমুখর ভাষায় তিনি স্রষ্টার অসীমত্বের সাধন সুযশময়তাকে আবিষ্কার করেছিলেন স্রষ্টারই অশেষ প্রশংসাধন্যতায়। ফলে মানুষ ও প্রকৃতিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে মাইজভাণ্ডারী সাধনার দার্শনিক প্রজ্ঞায় সন্নিবেশিত করে নিলেন তিনি। অনুপ্রবিষ্ট করলেন নিজের মহত্তম জীবনাচরণে, প্রলম্বিত আগুনের শিখার মতো প্রজ্ঞায় এ তত্ত্বকে, যা একজন মশহুর উর্দু কবি বলেছেন এভাবে— ‘মগর কিসি কা দিল না খোরো, ইয়ে খাস খোদাকা ঘর হ্যায়’ অর্থাৎ মানুষের প্রাণকে ধ্বংস করো না, এটা যে আল্লাহর আসল ঘর।

৩. শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) যুগের দাবীকে অস্বীকার করেন নি কখনো। অপার্থিব আধ্যাত্মিক ও মোহহীন পথে থেকেও কালের প্রয়োজন ও তাগিদকে তিনি বাতিল করে দেননি। সে জন্য তিনি মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন স্রষ্টার গুণান্বিত সৃষ্টি ঐশ্বর্য

হিসেবে। মানব কল্যাণের সপক্ষে সকল মানবিক তৎপরতা ও অগ্রযাত্রাকে তাই তিনি বরণ করেছেন স্রষ্টার অপরিসীম আশীর্বাদের ফলশ্রুতি হিসেবে। মানুষের শুভাশুভে তাই তাকে নন্দিত বিচলিত হতে দেখা যেতো। সময়ের পরিমাপে ও মানবিক নিষ্ঠায় ও একাত্মতায় তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অন্বেষণকে তুল্যমূল্য বিচারে মানব সভ্যতা ও প্রগতির ধারায় নিয়োজিত রাখতে নিজে যেমন অবদান রাখতেন, তেমনি অন্যকেও উৎসাহিত করতেন। শ্রমসিদ্ধ নিষ্ঠায় অবদান রাখতে অর্থাৎ পবিত্রতাই সুন্দর, আর প্রতিটি সুন্দরই পবিত্র—এ বোধকে তিনি অশেষ মগ্নতায় ও চেতনার শানিত লালনে বিদগ্ধ করে তুলতে ভালবাসতেন। আর পবিত্র ও সুন্দর প্রতিটি কর্মকে তিনি পুণ্য হিসেবে সামাজিক আবরণে আবৃত করে নিয়ে আশীষধন্য করতে কখনো কসুর করতেন না। এভাবে তিনি যুগকে জীবন ও কর্মের সাযুজ্যে স্রষ্টার সাধনা সুন্দর পথে প্রতিবিম্বিত করার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর থাকতেন।

উদার মুক্ত মানবতার সাধনা ছিল শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর আধ্যাত্মিকতার অন্যতম শিক্ষণীয় অনুশীলনের বিষয়। শোক সন্তাপ রোগ ব্যাধি জরা মৃত্যু ইত্যাদি প্রতিটি মানবিক অসম্পন্নতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরম ত্রাতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর পরিধি ছিল মানবের মিলন ক্ষেত্র। ধনী গরীব উচু নীচু তথা সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি সমাগত সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা হিসেবে আমৃত্যু বিরাজমান ছিলেন। তিনি আজ তাই মানবের মহত্তম ধারায় প্রেমের ঐশ্বরিক অভিধায় অমর। সকল জীবনের নিষ্ঠাবান ও একাত্মচিত্ত ঐশ্বরিক সাধনায় তাই তিনি স্থিত আছেন। যেন তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা, কোথায় রাখবো প্রণাম। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন প্রতিদিন চিরদিন। এ মহান সাধক প্রজ্ঞাবান মহাপুরুষ স্রষ্টার মহিমা বিদগ্ধ কামেল অলি হযরত শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খোশরোজে প্রখ্যাত কবি কাতীল শিপাই এর কবিতার ভাষায় শুধু বলতে পারিঃ

উড়তে উড়তে আস্ কা পস্তী দূর উয়াসনে ডুব गया,
রোতে রোতে বৈঠ গয়ি আওয়াজ কিসি সওদা কি।

অর্থাৎ আমার পাখী উড়তে উড়তে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ডাকবো যে সে শক্তি নেই! কাঁদতে কাঁদতে আমি পাগল হয়ে গেছি, আর এই পাগলের আওয়াজ একেবারে বসে গেছে! কণ্ঠে তার কোন শব্দ নেই।

আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম পলিটিক্যাল ইসলাম বলে কিছু নেই

আলোকধারা ডেস্ক

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, “নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম তথা জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ স্রষ্টায় পুরোপুরি সমর্পণ)। যাদের নিকট কিতাব রয়েছে তারা জেনে শুনেও শুধুমাত্র তাদের নিজেদের মধ্যে জিদ ও হিংসার কারণেই—এ সত্য জ্ঞান পাওয়ার পরও পরস্পর বিদ্বেষবশত এ বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আসলে যারা সত্য অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের যথাযথ হিসাব গ্রহণ করবেন। এটা সুনিশ্চিত সত্য। এরপরেও যদি কেউ আপনার সঙ্গে কলহ বা ঝগড়া করে আপনি বলুন: আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহপাকের নির্দেশে আত্ম-সমর্পণ করেছি। যদি তারা আত্ম-সমর্পণ করে ও অনুগত হয় তবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে। আর যদি বিমুখ হয় বা ফিরে যায়, তবে প্রচার করা বা পৌঁছিয়ে দেয়াই আপনার দায়িত্ব। আল্লাহপাক স্বীয় বান্দাদেরকে দেখছেন”— (সূরা আলে ইমরান : ৩ : ১৯-২০)।

ইসলাম অর্থ আত্ম-সমর্পণ। অর্থাৎ আল্লাহপাকের আদেশ-নিষেধ অবনত মস্তকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে প্রাসঙ্গিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হবার নাম ইসলাম। ‘ইসলাম’ শব্দটি ‘সলম’ বা সালামা ধাতু হতে নিস্পন্ন হয়েছে বিধায় এর আরেক অর্থ ‘শান্তি’। হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত সকল নবীরই প্রচারিত একমাত্র ধর্ম তথা জীবন বিধানের নাম ‘ইসলাম’। ইসলামই মানবজাতির একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম। এ জন্যে এ ধর্মকে বলা হয় ফিতরৎ তথা প্রকৃতির ধর্ম। আল্লাহ পাকের একক এককত্ব এবং অদ্বিতীয়ই এই সত্য ধর্মের মূল সূত্র। প্রত্যেক নবী রাসূল, পয়গম্বর এই একটি শাস্বত সত্যবাণীই মানবজাতির সম্মুখে বার বার প্রকাশ এবং প্রচার করেছেন। এ কারণে আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই ইসলামের নবী-রাসূল হিসেবে স্বীকৃত, সম্মানিত, শ্রদ্ধা এবং মর্যাদাপ্রাপ্ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নবীর অবর্তমানে বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, একত্ববাদ তথা তাওহীদ বিরোধী অবস্থান, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতার অঙ্ককার ভূবনে অবনমিত হয়ে বিভিন্ন নবীর অনুসারীরা ধিকৃত এবং প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে কলুষিত

জীবনবাদে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। নিজেদের অন্তর্বর্তীকালীন ধর্ম বিধানকে জীবনাচারে যথাযথভাবে অনুশীলন না করে নানা কারসাজিতে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন সময় মানুষের মূল ধর্ম ইসলামের অপব্যখ্যা দিয়ে জনসমাজে বিভ্রান্তির অবতারণা করেছে। বিশ্বনবী (দ.) এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ধর্ম সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধর্মাচারীদের অবস্থান ছিল বিতর্কিত। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদেরই প্রচার করা বিতর্কিত পরিপূর্ণ বিভ্রান্ত একটা ধারণার নাম ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ এবং ‘অরাজনৈতিক ইসলাম’। এটি মূলত: ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের অভ্যন্তরে বিভ্রান্তি এবং কলহ-বিবাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস হিসেবে সুবিধাবাদীরা ব্যবহার করে থাকেন।

মার্টিন ক্রেমার ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি নিজে ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। খ্রিস্ট ধর্মচর্চা সম্পর্কে ধারণা থাকার কারণে তিনি ধর্মের আবহ ও ধর্ম পালনকে শুধুমাত্র গীর্জাকেন্দ্রিক পাদ্রী নিয়ন্ত্রিত পুরোহিততন্ত্রকে ধর্ম মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ধর্ম ইহজাগতিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরোপুরি পারলৌকিক বিষয়। পার্থিব কাজকর্ম লেন-দেন, সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণে আদর্শবোধ-নীতি নৈতিকতা তথা ধর্মীয় নির্দেশনা অপ্রাসঙ্গিক-যার অর্থ ‘সীজারের পাওনা সীজারকে দাও-ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে।’ পার্থিব জীবনবাদ এবং বোধন সম্পর্কে দ্বিচারিতায় অভ্যস্ত পাশ্চাত্য সমাজের আলোকে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেন। তাঁর ধারণা ছিল সুফিবাদ, তাবলীগ জামায়াত এবং পীর-মুরিদ ভিত্তিক ইসলামই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। তাঁর মতে সুফি, তাবলীগ এবং পীররা পার্থিব জটিলতা এবং কাজ কর্মে যেহেতু সক্রিয় থাকেন না, শুধু পারলৌকিক বিষয় সম্পর্কে মানুষকে চর্চায় রাখতে তৎপর থাকেন সেটিই মূলত ইসলাম ধর্ম। এর বাইরে অন্য প্রক্রিয়া এবং সংগঠন ভিত্তিক কার্যকলাপ হচ্ছে রাজনীতি। মার্টিন ক্রেমারের মতে ইসলাম ধর্মের নামে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্র বিষয়ক সকল কার্যক্রম হচ্ছে রাজনৈতিক ইসলাম।

ইতোমধ্যে ব্যাপক অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন গবেষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেমারের ধারণায় পরিবর্তন

আসে। ২০০৩ সালে 'POLITICAL ISLAM' শব্দ ব্যবহারকে তিনি 'অসঙ্গত' ধারণা প্রাপ্ত হয়ে এ ধরনের শব্দ আর আলোচনায় আনেন নি। এ সময়ে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জানার ব্যাপ্তি সমৃদ্ধ হওয়ায় তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, ইসলাম ধর্ম সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশসহ পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত অত্যন্ত সমৃদ্ধ সার্বিক মানব ধর্ম। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় নিজের ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের মতো পাদ্রী-যাজক ভিত্তিক ধর্ম চর্চাকে তিনি প্রকৃত ধর্ম ভেবেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বুঝানোর লক্ষ্যে 'POLITICAL ISLAM' শব্দ ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে তাঁর মতামত পরিবর্তন করেন। বর্তমানেও কোন কোন মহল রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনকল্পে ইসলামের পরিভাষা ব্যবহারকে 'POLITICAL ISLAM' শব্দে অভিহিত করে থাকেন।

পবিত্র কোরআনে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম”- (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩)। উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথমার্শে উল্লেখ আছে “তারা বুঝতে পারছে তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল। তাই ওদের পরোয়া করবেন না। শুধু আমার (বিরাগ ভাজন হওয়াকে) ভয় করুন।” সূরা মায়িদা'র আংশিক এই আয়াতে (১) সত্য পরিত্যাগকারী এবং অস্বীকারকারীকে ভয় বা পরোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে (২) শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ করা হয়েছে-যা তাকওয়া তথা পরহেজগারীর নির্দেশনা হিসেবে ঘোষিত। (৩) এ আয়াতে ধর্ম বিধান, নেয়ামত পরিপূর্ণ করার বিষয়ে উল্লেখ করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে আল্লাহ মনোনীত করেছেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলতে ইহজাগতিক এবং পারলৌকিকতাকে একই সূত্রে সম্পর্কযুক্ত জীবন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এখানে ইসলামী ধর্ম বিধান অর্থ ইহজাগতিক কার্যাবলীর কর্মফলে নির্ধারিত হবে পারলৌকিক জীবনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা। আল্লাহকে 'ভয় করা' সম্পর্কিত যে বিষয়টি আয়াতে উল্লেখ করা আছে তা বস্তুতপক্ষে আল্লাহর প্রতি প্রেমানুগত্যের অতি স্পর্শকাতর বিষয়। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্দার সম্পর্ক এতোই গভীর, সুবিশ্বাস এবং আস্থার যে বান্দার বিন্দুপরিমাণ বিচ্যুতিতে সম্পর্কে ছেদ পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এক মণ দুধের মধ্যে এক ফোটা চনা পড়লে যেমন তা পরিত্যক্ত হয়, তেমনি আল্লাহর সঙ্গে প্রেমমধুর সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ ক্রটি বা

হেয়ালী দেখা গেলে তা আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনে তাঁর বান্দাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এটি যেহেতু নৈতিক সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং জাগতিক প্রতিটি কর্মের জবাবদিহিতার বিষয় সেহেতু এটি 'তাকওয়া' ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মে 'তাকওয়া' অর্জনের সুস্পষ্ট পন্থা হচ্ছে 'তাসাওউফ' সাধনা-যা সূরা মুজাম্মিল'র ২০নং এবং সূরা ফোরকানের ৬৪ থেকে ৬৬নং আয়াতসহ অনেক সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে যতোবার 'সালাতের' বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে পাশাপাশি 'যাকাত' আদায়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 'সালাত' মূলত আল্লাহর প্রতি সরাসরি আনুগত্য প্রকাশ সম্বলিত বিধিবিধান সংযুক্ত 'হক্কুল্লাহ'-অর্থাৎ আল্লাহর হক আদায়ের নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে 'যাকাত' সুস্পষ্টভাবে বান্দার প্রতি বান্দার 'হক' তথা অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা আল্লাহর নির্দেশ নামা-যা 'হক্কুল ইবাদ' নামে ব্যাপকভাবে উল্লেখ্য হয়ে আসছে। যাকাত সামগ্রিক অর্থে পার্থিব জগতে মানব কল্যাণ এবং সামাজিক সুকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক জনিত আল্লাহর নির্দেশনামা। যাকাতের নিয়মাবলীর সঙ্গে তাই রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থাপনার দিকও। ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত যাকাত বিষয়ে পৃথিবী জুড়ে বিগত শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমাজবিজ্ঞানী ভিন্মতাদর্শী মনীষী, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অন্যতম রচয়িতা “সর্বহারাদের হারাবার কিছু নেই, কিন্তু জয় করার মতো আছে সমগ্র পৃথিবী” বিপ্লবী পদবাচ্যের উদ্গাতা কার্লমার্কস'র একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ আরবি পত্রিকা 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ'এ ছাপানো হয়েছে। তাঁর লিখিত নিবন্ধে কার্ল মার্কস যাকাত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, “এই ট্যাক্স (যাকাত) একটি ধর্মীয় কর্তব্য, এটি আদায় কর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। ধর্মীয় দিক ছাড়াও যাকাত একটি প্রাণবন্ত দৃঢ় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার হাতিয়ার। এটিই মুহাম্মদী রাষ্ট্রের কোষাগার। এর দ্বারা অভাবী, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা হয়। ইতিহাসের এ বিরল পদ্ধতি সর্বপ্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে। যাকাত এমন এক ধরনের ট্যাক্স যা ধনী, সম্পদশালী বিত্তবান ও ব্যবসায়ীদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের অক্ষম, প্রতিবন্ধী, এতিম, নিঃস্ব ও অনাথদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় বিরোধপূর্ণ দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ পদ্ধতির আওতায় সমগ্র জাতি একটি ন্যায় ও

ইনসাফপূর্ণ নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। যাকাতে মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পেছনে কখনো পারস্পরিক শত্রুতা অথবা বিদ্বেষ ছিলনা। এর ন্যায়সঙ্গত ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি যে নবীর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত।” ইসলাম ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে কার্ল মার্কস আরো উল্লেখ করেন, “হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র মাধ্যমে মুসলমানদের যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এর ভিত্তিতে তারা বিশ্বশ্রষ্টা ছাড়া আর অপর কারো আনুগত্য স্বীকার করে না। মুসলমানরা স্বাধীনতার মহান শিখরে প্রতিষ্ঠিত। যদি ইসলামী স্বাধীনতাকে ইউরোপের উন্নততর স্বাধীনতার সাথে তুলনা করা হয় তবে ইউরোপের উন্নততর স্বাধীনতাকে অত্যাচার ও প্রহসন মনে হবে।” ইসলাম যে মূলত একটি অতি সুউচ্চ নৈতিক এবং উন্নত সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোও বিশ্ববাসীর জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিল তা কার্ল মার্কস’র নিবন্ধে স্পষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত এ ধরনের গণঅধিকারমুখী পরিপূর্ণভাবে অকপট, অত্যন্ত সহজ-সরল সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে ‘তাকওয়া’-যা অন্তরের বিশুদ্ধতা ব্যতীত অর্জিত হয় না। মানব অন্তরে বিশুদ্ধতা অর্জনের মৌলিক সিলেবাস হচ্ছে তাসাওউফ সাধনা।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সুগভীর দূরদৃষ্টি এবং রাষ্ট্র নির্মাণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক এ পি স্কট, ‘মনুমেন্টাল হিস্ট্রি অব দ্য মুরিশ এমপায়ার ইন ইউরোপ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধানের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। তাই ইতিহাস অতি গর্বের সাথে তাঁকে জাতি গঠনের সুনিপুণ শিল্পী উপাধি দিয়েছে।”

ইংরেজ পাদ্রী আইজ্যাক টেইলর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “শুধু ইসলাম ধর্মেরই এ বিশেষত্ব যে, মানুষের জীবনের সামগ্রিক অধিকারে জাতির প্রত্যেকটি বক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সঠিক সাম্যের বাস্তব রূপ দিয়েছে। বিভিন্ন বর্ণ ও বংশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমঝোতা ও সহানুভূতি ইসলামের সূচনা লগ্নে সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর অমুসলিম সম্প্রদায় তাদের শেষ যুগেও এমন নমুনা পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম কেবল পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন বর্ণ ও বংশের মানুষের মধ্যে অধিকারে সমতা বিধান করে তাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করেছে, তা নয়; বরং বলা যায়, ইসলাম এতে সফল হয়েছে। আফ্রিকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে ছোট-বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে, একতা, সাম্য ও সমঝোতার কোন পথ ছিল না। একমাত্র ইসলামই

তাদের সংঘবদ্ধ করে সবাইকে ভাই ভাইয়ের বন্ধনে দাঁড় করিয়েছে। এসব কিছু ইসলামের নবী মুহাম্মদ (দ.)’র আদর্শ ও মহত্বের বড় প্রমাণ, যা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।” বিখ্যাত অমুসলিম মনীষী লিউ দারবিজ উল্লেখ করেন, “ইসলাম মানবতার স্বভাবজাত একটি অর্থনৈতিক, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ধর্ম। যখনই আমরা মানব রচিত আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই দেখতে পাই, তা আগে থেকেই ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু আমি এটিও অবহিত হয়েছি যে, প্রসিদ্ধ আইনবিদ জন সেমবল “স্বভাবজাত বিধান” নামের যে আইনশাস্ত্র রচনা করেছেন, তার সব আইন, ধারা ও ধারণাগুলো ইসলাম থেকে নিয়েছেন। যখন মুসলমানদের অন্তরে ওই ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হলাম তখন জানতে পারলাম, তাদের অন্তর ইসলামের বরকতে বীরত্ব, ঔদার্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, কল্যাণকামিতা, সৌন্দর্য, নেকী, সততা, সহমর্মিতা, বিনয়, দানশীলতা প্রভৃতি বহুগুণে সমৃদ্ধ। আর সবকিছু মুহাম্মদ (দ.)’র শিক্ষার কারণে।” উপর্যুক্ত অমুসলিম মনীষীদের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়েছে যে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয়, বরং এটি সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এক কথায় ইসলাম হচ্ছে জীবনবাদী ধর্ম। পার্থিব জগতে এ ধর্মের পরিপূর্ণ অনুশীলনেই রয়েছে পারলৌকিক মুক্তি। ইসলাম ধর্মের জীবনবাদীতায় ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইবাদত প্রতিটি একাত্মভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) পার্থিব জগতে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়ে আল্লাহ’র চিরন্তন সান্নিধ্য লাভের জন্যে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি বিশ্ববাসীর জন্যে রেখে গেছেন অনুপম জীবনবাদী আদর্শ-যা ইসলাম ধর্ম নামে অভিহিত এবং অভিনন্দিত।

ইসলাম ধর্মে রাজনৈতিক ইসলাম ‘POLITICAL ISLAM’ বা অরাজনৈতিক ইসলাম ‘NON POLITICAL ISLAM’ নামে কোন সবক নেই। ইসলাম ধর্মানুসারীরা তাদের জীবন ব্যবস্থায় পরিপূর্ণতা এবং নিখাদ মানবিক ধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাসাওউফ সাধনাকে অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ তাসাওউফ সাধনা ব্যতীত নিছক ব্যক্তিগত আচারিতায় সং এবং মহৎ মানবিক গুণাবলী অর্জন সম্ভব নয়। যে কোন ব্যক্তির সদগুণাবলীর তাৎপর্যময় প্রতিফলন ঘটে সমাজ তথা সামষ্টিক কর্মপ্রবাহে। তাই ইসলাম ধর্মানুসারীদের জন্য ‘লোক দেখানো-মন ভুলানো-চোখ জুড়ানো’ ইবাদতকে ‘রিয়া’ আখ্যায়িত করে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধরনের কথিত ইবাদত মহান আল্লাহ্ ঘৃণাতরে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা

দিয়েছেন। কারণ হককুল্লাহ্ অথবা হককুল ইবাদ যে কোন ধরনের ইবাদতই হোক না কেন এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর সন্তুষ্টি ভিন্ন অন্য কোন কারণে সম্পন্ন হবার নয়। এ কারণে সাধকের অলৌকিকতা প্রদর্শনসহ সকল প্রকার ইবাদত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, সব আলামত আর নির্দশন আল্লাহুতালার।

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ইসলাম, অরাজনৈতিক ইসলাম তথা সুফিবাদী জীবন নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা লক্ষ্য করা গেছে তা শব্দ দুটির প্রবক্তা মার্টিন ক্রেমার নিজেই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ব্যাপক অধ্যয়নের পর আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলাম ধর্ম অনুশীলনের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে আত্মশুদ্ধি অর্জন-যা সুফিতা ব্যতীত অসম্ভব।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে, বিশ্বনবী (দ.) যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রকৃত অর্থে শাসনের মানদণ্ড দিয়ে নয় বরং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে অতীব কল্যাণকর সমাজ পরিচালনা ব্যবস্থা হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি পেয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন শিরোনামে সর্বত্র বহুল প্রশংসিত এ ব্যবস্থা মাত্র ত্রিশ বছর টিকে ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বদানকারী মহান খলিফারা ছিলেন প্রত্যেকেই তাকওয়া নির্ভর সুবিখ্যাত তাসাওউফ সাধক এবং ইসলামী জীবনবাদের পথ প্রদর্শক। তাই বলা যায় খোলাফায়ে রাশেদীনই-অন্যকোন কিছু নয়। আধুনিক সমাজে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার নামে যা প্রচলিত আছে তার কিতাবগুলোর কোন কোনটি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, “শয়তানের হাতে লিখা”; “ক্ষমতার ব্যাকরণ”। সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকে বর্তমান সময়ের একশ্রেণির রাজনীতিবিদের অনৈতিকতা, ভণ্ডামি, দল বদল, আদর্শ পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন “নিত্যদিনের শয্যা সঙ্গী বদলানো চরিত্রহীন বিবর্ণ ব্যক্তি”, আর দার্শনিক রাসেল রাজনৈতিক দলকে বলেছেন “বদমায়েশদের শেষ আশ্রয় স্থল”। ইসলাম ধর্মের মহান গ্রন্থ আল-কোরআন কখনো প্রতারণা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন, জাহেলিয়াতকে অনুমোদন করেনি বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিয়েছে। তাই প্রচলিত রাজনীতির সংজ্ঞা এবং ধারণার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সম্পর্ক চিন্তা করে ‘POLITICAL ISLAM’ সনাক্তকরণ বস্তুনিষ্ঠ ধারণা নয়। তবে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলাম ধর্মের খোলস নিয়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা হচ্ছে ধার্মিকতা

পরিত্যক্ত রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রকে কখনো ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে নি। বরং এটিকে সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ইসলাম থেকে বিচ্যুতি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এ ধারা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ঠিকানা নির্ধারণে অসীম সাহসিকতায় জীবন উৎসর্গ করে শাহাদত বরণ করেছেন আহলে বাইতের পবিত্র সদস্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। ইসলামী জীবনবাদের বিকৃতি সাধনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শ সংরক্ষণে তাঁর গৌরবময় অবদানকে তাই “হোসাইনী ইসলাম” বলা সঙ্গত নয় বরং ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকল্পে হযরত হোসাইন (রা.)’র ভূমিকাকে হোসাইনী স্পিরিট তথা হোসাইনী উদ্দীপনা নামে অভিনন্দিত করাই শ্রেয়। কারবালা প্রান্তরে তাঁর কোরবানী’র কারণে নির্দিষ্ট হয়েছেন তিনি ইসলামের এক অনন্য ঠিকানা এবং বিরল উপমা। তাই বিভিন্ন বিশ্লেষণ সংযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে কোন রূপ বিভাজন প্রত্যাশিত নয়, কারণ ইসলাম ধর্ম মাত্র একটিই, সূরা মায়েরদার ৩নং আয়াত অনুযায়ী যা বিশ্বনবী (দ.)’র মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সুফি উদ্ধৃতি

- এক দেহরহাম কুরযে-হাসানা (ধার) প্রদান করাকে হাজার দেহরহাম সদকার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় বলে মনে করি।
- সেই ব্যক্তি কখনো ইবাদতের স্বাদ পাবে না, যার অন্তরে আল্লাহুতাল্লাহকে পাওয়ার জন্য আগ্রহ এবং উৎসাহ জন্মে নি।
- যে ব্যক্তি তাঁর সন্তান-সন্ততিকে দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং নেক পথে পরিচালিত করে, রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নিজ সন্তানদের ঘুমের মধ্যে সতর অনাবৃত হলে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়, তবে তার এই আমল জিহাদের চেয়েও অধিক ফজিলতপূর্ণ।
- দুনিয়াদার লোক যার খুব বেশী কদর ও সম্মান করে, তার কর্তব্য নিজেকে নিজে খুব অপদার্থ ও তুচ্ছ মনে করা। যার ফলে আত্মগরিমা হতে নিরাপদ থাকতে পারে।

– হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)

ফতুহাতে মক্কিয়া

[বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক এবং তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর (ক.) অমর গ্রন্থ ‘ফতুহাতে মক্কিয়া’। তাসাওউফ সম্পর্কিত সুউচ্চমানের এ গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত অনুবাদের অগ্রগতি অতি সীমিত। মহান স্রষ্টা এবং প্রতিপালক আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের সর্ববিষয়ে একক এবং অবিনশ্বর আধিপত্য তথা ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ বিষয়ে হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর ধারণা সম্বলিত ফতুহাতে মক্কিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ আকারে পাঠক সমীপে পেশ করার উদ্যোগ আলোকধারা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। আলোকধারা জুলাই-’২১ সংখ্যায় অনুবাদের প্রথম কিস্তি ছাপানোর মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিকতার সূচনা। অনুবাদ করেছেন আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী – সম্পাদক]

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কবিতার অর্থ—

যখন আমার সুউজ্জ্বল সুন্দর শরীর পবিত্র কাবা পর্যন্ত পৌঁছল, আমি আমিন (নিরাপদ) ব্যক্তিবর্গের সুউচ্চস্তর অর্জন করে ফেললাম। সাঈ ও তাওয়াফের পর একান্ত স্তরে নামায পড়লাম, নিজেকে নিজে কাবার পবিত্র ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য করে নিলাম।

যে ব্যক্তি বলেছিল এই কার্য ফরজ এবং ওয়াজিব, এটা সম্পাদনকারী শেষ সংবাদদাতা।

ঐ স্তরে আমি মালায়ে আ’লা (ফিরিশ্তা জগত) কে দেখলাম এবং আদম (আ.)-এর সাথীগণের সাথে অন্তর্ভুক্ত হলাম।

ওখানে আদম (আ.) এর এক সন্তানকে বসা দেখলাম। যিনি বড় বড় “কারিম” বা সম্মানিগণের মধ্যে “আকরম” বা অতি সম্মানিত, প্রশস্তকে আরো প্রশস্তকারী, পূর্ণ আনুগত্যতার মালিক, অত্যধিক অনুগত।

ঐ লোকগুলো কাল পোশাকাবৃত পবিত্র কাবার উপরিভাগে তাওয়াফরত, ঐ লোকগুলো চাদরে লটকানো ফুলগুলোর সাথে লটকানো অবস্থায় (নৃত্যরত) চলমান।

তাদের এই নৃত্যতার গৌরবান্বিত ও অহংকারীতার জাঁকজমকতা পরিলক্ষিত।

আমার পিতা আদম (আ.) সম্মানিত ফিরিশ্তার আগে আগে দুর্বলতার সাথে আস্তে আস্তে চলছিলেন।

এই বান্দা (ইবনে আরবি) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মত ঘাড়বাঁকা অবস্থায় নিজের পিতার (আদম) সামনে দণ্ডায়মান ছিলাম এবং জিব্রাইল আমার সামনে ছিল।

নিজ পিতার সেবায় আমি “মায়ালিম” (মানচিত্র) ও “মানাসিক” (পালনীয় কর্তব্যের তালিকা) হাতে নিয়ে রেখেছি যেন তিনি নিজ সন্তানদেরকে তা বণ্টন করতে পারেন।

আমি নিজ পিতার এমন সুউচ্চ পদসুলভ মাহাত্ম্যতা দেখে সকল ফিরিশ্তাদের উপর আশ্চর্য হলাম, এইজন্যই যে, তারা কিভাবে তাঁকে (আদম) জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি ও রক্তপাত ঘটানোর অপবাদ দিল!!

যখন তিনি লুকায়িত ছিলেন নিজের অন্ধকারময় মাটির বলয়ে আবৃতাবস্থায় আর সকল কিছুর নাম সমূহের দীপ্তি/প্রভা তথায়

পরিবেষ্টিত ছিল, তিনি তা তাদের (ফিরিশ্তাদের) সামনে বের করলেন।

তখন তিনি ছাড়া তাঁর সম্মুখে কেউ ছিলনা, শুধু ফিরিশ্তাগণই যার সাক্ষী ছিল। ঐ সময় আমাদের সম্মানিত পিতা (আদম) নিজের বন্ধু ও শত্রু একত্রিত করার মকামে (স্তরে) ছিলেন। তিনি “মুওয়াইহাত” (পানির বিন্দু) এবং “নুওয়াইরাহ্” (কোষ কেন্দ্রকের মধ্যস্থিত গোলাকার গঠন বিশেষ, Nucleolus) অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও অপ্রিয়ভাবে মজবুরান আমাদের সম্মুখস্থ হলেন।

অতপর তাঁর (আদম) খামির (প্রকৃতি) এমন বস্ত্র থেকে উঠেছে যার মধ্যে বৈপরিত্যপূর্ণ বস্ত্রসমূহের উপস্থিতি ছিল। এ জন্যই তারা (ফিরিশ্তারা) মূলত ঐ কাঠিন্যতার অপবাদ দিয়েছে এবং বলেছে! আমরা সকাল-সন্ধ্যা আপনার তাসবিহ্ ও প্রশংসাকীর্তন করছি এবং আরো বলেছে! আমরা আপনার “নূরে জালাল” (প্রভাব প্রতিপত্তিময় আলো)’র মাধ্যমে পুতপবিত্র এবং আমাদের পিতার বেলায় প্রত্যেক প্রকারের কাঠিন্যতা প্রকাশ করেছেন!

ফিরিশ্তাগণ হযরত আদম (আ.)’র বাম পাশকে দেখল এবং ডান পাশে দেখল না। যেটা অত্যধিক আলোকময় ছিল। অর্থাৎ তাঁর অন্ধকার রাজ্যের দিকে তাকাল, আলোকময় রাজ্যের দিকে তাকাল না।

এবার ফিরিশ্তারা নিজেদেরকে অক্ষম জ্ঞান করে হযরত আদম কে মালিক ও আঁকা ধ্যান করল। যারা ইতিপূর্বেও নিজেদেরকে একচ্ছত্র আধিপত্যকারী ও বিজয় অর্জনকারী ধারণা করত।

কেননা যিনি আপন বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (দ.) কে মিরাজের (উনুজ্জ মিলনের) জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ.) এর মধ্যে সমস্ত নামাবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

ফিরিশ্তারা অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তানের বিতর্ক দেখেছে। যে কিনা তাঁর (আদমের) দিকে প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে চেয়ে আছে! তার (শয়তানের) সাথে আমাদের পিতার (আদমের) সাথে “মুনাফিকিয়ত” (কপটতা) “আসুসাত” (অবাধ্যতা) “শহওয়াত” (যৌনতা) “হাওয়া” আকৃতির প্রকাশ পেল।

ফিরিশ্তারা সব জেনে গেল যে শয়তান এবং আদম (আ.)’র মধ্যে দ্বন্দ্ব অগত্যা, হতে দ্বিধা ও অস্বীকারের কোন সুযোগ

নেই।
তাই তারা (ফিরিশ্তারা) যা বলেছে তা এ জন্যই বলেছে
সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে এবং
“সালিহীন” (সৎ কর্মপরায়ণ) দের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।
অতএব ফিরিশ্তাদের “ফিত্রত” (প্রকৃতি) এবং “জিবিল্লত”
(স্বভাব) ভাল বা কল্যাণের উপর স্থিরমতি করা হয়েছে। এজন্য
তারা শত্রুতা, ক্রোধান্বিতার ধারণা করতে পারেনা।
এবার আমি দেখতে রইলাম, ফিরিশ্তা ও আমাদের সম্মানিত
পিতা (আদম আ.) একই মজলিশে অবস্থানরত। আর
ফিরিশ্তা সর্দার (জিব্রাইল) তাঁর সেবায় নিমগ্ন।
বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই ন্যায় পরায়ণতার খাতিরে তাদের
আপত্তির শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য এই খাদেমিয়তের স্তর
নির্ধারণ করেছেন।
পরন্তু ফিরিশ্তাগণ প্রথম দিনই তাদের আপত্তির দায়ে
শাস্তিরূপে আদম (আ.)’র খেদমতের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ছিল।
ইতিহাস আমাদের স্বাক্ষী দেয় “বদর দিবসে” রাসুলে পাক
(দ.) “মাহ্বে ইসতিরাহাত” (স্বস্তিময় অবস্থানে) ছিলেন
তদস্থলে ফিরিশ্তাগণ যুদ্ধ করেছিল।
হুজুর (দ.) আপন আরশে খুসু, খুজু (শিষ্টতা ও বিনয়ী)
অবস্থায় নিজের দুর্বল লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র রাজ দরবারে
সাহায্য কামনায় ক্রন্দনরত ছিলেন।
যখন আমি এই সকল কিছু হাকিকত নিরীক্ষণ করেছি তখন
আমার দীলের সকল কল্পনা-জল্পনা, অনুমান, সন্দেহ উধাও
হয়ে গেল।
তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করছিলেন, তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ উদ্দীপনার
সাথে সফরকারী প্রত্যেক “তালিবে হিকমত” (হিকমত
অন্বেষী) তা শুনছিল। যারা আপন মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে গহিন
অরণ্যের মুসাফিরিত্ব গ্রহণ করেছেন। তারাও শুনছিল।
(এ আওয়াজ ছিল এটা) ওহে সেই সকল মুসাফিরগণ যারা
আমার একান্তগণের সঙ্গে সামিল হতে গহীন অরণ্যে ধ্যানমগ্ন
হয়ে এবং মরুদ্যানগুলো পাড়ি দিয়ে আমার দিকে
প্রত্যাবর্তনকারী।
তোমরা আমার মনোরঞ্জনার্থে, যার সঙ্গে সাক্ষাত হয় তাকেই
আমার এই কথা বলে দাও যা আমার যথোপযোগী শেষ
উপদেশ বাণী।
তাকে একথা বলে দাও যে, যদি তোমার কাছে আমার সংবাদ
ও বাণীর আওয়াজ না পৌঁছায় তবে তুমি শেষ পর্যন্ত
বিস্ময়করভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে।
যে ব্যক্তির সন্মানে আমি (লিখক) আত্মহানিত হয়ে অনেক কাল
যাবত ধ্যানমগ্ন ছিলাম, তাঁকে আমি এক সবুজ তরুতাজা মাঠ
সংলগ্ন পর্বত চূড়ায় পেয়ে গেলাম।
আর ঐ সবুজ তরুতাজা মাঠ (Tunis) তিউনিস এলাকায়।
তাঁর ঐ বুজুর্গীয়ময় মকাম যার মাটিও পবিত্রময় এবং যা এক
বরকতময় কেবলায় পরিণত।
এক নির্দিষ্ট বিস্তীর্ণ জমির উপর যা একান্ত পছন্দসই, এটার
মধ্যে বসবাসকারীগণ “নজিবুল আসল” (আদি অভিজাত) ও
অত্যন্ত শরিফ (মর্যাদাবান)।

তিনি ঐ লোকগুলোর সাথে নূরানী হেদায়তের জ্ঞান নিয়ে
চলেন। যা তাঁর কাছে “সুন্নতে বয়দায়া” হতে অর্জিত।
তাঁর জিকির (সবার) মুখে অনাবিল থাকে। যা সকাল সন্ধ্যা
প্রতিনিয়ম “মাযারেফে তাজাল্লী” (পরিচিতির মাহাত্মতা)
অনুদিত।
তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো, যা সর্বক্ষণ সুউজ্জ্বলতার
সাথে রাত্রিকে আলোকিত করে দেয়। তিনি ঐ ব্যক্তির সন্তান
যাঁর শানমান একান্ত একক। যার হাকিকত প্রকাশমান হাকিকত
হতেও আরো উচ্চ স্তরের।
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত সন্তানগণ তাঁর চতুর্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান
তিনি “ইমাম” আর তাঁর সন্তানগণ “আবদাল”।
বরং তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদ তাঁর সন্তানগণ আকাশের
তারকার মতো যেগুলো চাঁদকে ঘিরে রেখেছে।
যখন তিনি কোন “হেকমতে উলুক্বি” (আসমানী উচ্চ স্তরের
হেকমত) বর্ণনা করেন মূলত তা “আলমে এনকায়া” (অমর
পাখির রাজ্য)’র সংবাদ।
আমি তাঁর সাহচর্যে অনেকদিন ছিলাম হঠাৎ এক বুজুর্গ মহিলা
বাহির থেকে এসে তাঁর সম্মতি অবস্থায় পাশে দণ্ডায়মান হয়ে
গেলেন।
তিনি (মহিলা) তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত প্রেমিকা “আহবার” (পণ্ডিত
জ্ঞানী) গণদের একজন যিনি ঐ গুপ্তরত্ন উদ্ধারকারীদের সর্দার।
“নাজ্জার” (পর্যবেক্ষক) ও “ফোক্‌হা” (পণ্ডিত) গণের দল
উপদল সমূহের মধ্যে তিনিই বেশি মর্যাদাপ্রাপ্ত।
আমি তাঁর সামনে রাত দিন অবস্থান করে তার নৈকট্যের
ফজিলত অর্জন করেছি।
তারপর আমি তাঁকে ছেড়ে তাঁর থেকে (এমন আদবের সাথে)
বিদায় নিচ্ছি তখন তিনি তা দেখে রইলেন, যেমন একজন
শিক্ষক শিক্ষার্থীকে চেয়ে থাকেন।
তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, আমার বংশধর
ও প্রাচীন বন্ধুদের মধ্যে তুমি আমার কাছে খেয়ানতকারী, তুমি
আমার তওবাকারীদেরকে পাকড়াও করেছ। যাদের দ্বারা
আমার ঘর স্থিত এবং তা থেকে তুমি আমার সাথীদের বেখবর
রেখেছ।
আমার নিয়ত ও হালত সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভাল জানেন তাঁর
(আল্লাহ্‌র) তায়েবদের সঙ্গে আমার ওয়াফাদারীর সত্যতার
ক্ষেত্রে।
আমি তো এখনো নিজের সেই পুরাতন “আহাদ” বা
স্বীকারোক্তির উপর আছি এবং আমার অন্তরে এখনো তাঁর প্রেম
হারকিসিমের মনোবেদনা হতে মুক্ত।
যখন আমার মধ্যস্থতা এমন কোন ব্যক্তির সাথে হয়, যে
হেকমতের কোন কথার সুস্মৃতির শেষ স্তর কংকরময় মরুভূমির
ঝাউঘেরা হাওড় পাড়ে তালাশ করে, তখন আমার আশ্চর্য
লাগে।
আমি তাকে বলি, হে “তালেবে আসরার” বা রহস্য সন্ধানী!
তুমি এমন ব্যক্তির সান্নিধ্য অর্জনে তরান্বিত হও, যাকে তুমি
(সামনে) পেয়েছ, যিনি জীবন মরণের স্তরগুলোর মূল রহস্য
জ্ঞাত।

যখন আমি “অজুদে কায়েনাত” (অস্তিত্বময় বিশ্ব) কে দেখেছি, ভূমণ্ডল হতে পানির তলদেশ পর্যন্ত তাঁর দু’পায়ের নিচে। তাঁর জাত (সত্তা) ব্যতীত কোন কিছু তার উপর বিজয়ী নয়। তিনি যা চান। কেননা তিনি সকল বস্তুর উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করেন।

যখন তিনি “আলমে তকবিন” (মানব জগৎ) সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন পবিত্রতার চাদর ঢাকলেন পরিধেয় বস্ত্র বিছিয়ে দিলেন, যখন তিনি নিজের “অজুদ” (অস্তিত্ব) কে উপভোগের ইচ্ছা করলেন তখন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রতি গভীর চিন্তাশ্রিত দৃষ্টি দিলেন।

তাঁর চাদর, পায়জামাকে পায়ের নিচে পর্যন্ত ফেলাকে আপন সাথীদের কাছে নিজের অহংকার ও সুউচ্চতা প্রকাশের জন্য ছিল।

এই নির্দেশনার পর আমার সামনে এমন এক “অজুদ” (অস্তিত্ব) দৃশ্যতর হল যা কোন “ইসিম” (নাম) বা “সিফাত” (গুণ) হিসেবে নিরূপনের জন্য “মোকাইয়দ” (নির্দিষ্ট) করা উচিত নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে তিনি কে? যার প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখর। তবে আমি বলব, আমার “মামদুহ” (প্রশংসিত) “আমীরগণের আমীর” “মুহাক্কিক” (উদাহরণ দ্বারা প্রমাণকারী)।

যিনি “হাকিকতে”র (বিকশিত সূর্য) “ইমাম” এবং “কুতুব” যিনি “সিররুল ইবাদ” (বান্দার রহস্য) “আলিমুল ওলামা” (জ্ঞানীগণেরও জ্ঞানী)।

তিনি এমন বান্দা যার উপর সর্দারির চিহ্ন পরিলক্ষিত। যিনি চোখের আলো ও শেষ খলিফা।

তিনি সৃষ্টি জগতের বালা-মুসিবত হরণকারী পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি দাতা, জগত সমূহের দয়াদ্র “গাউস”।

তাঁর “জালালী”, “জামালী” সিফাত ও আজমত কদর ও ইজ্জত সাধারণ জনতার সৃষ্টির অনেক উর্ধ্বে।

তিনি স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে এক জাতির সর্দার হন। যারা তাঁর কারণে প্রত্যেকে সুরক্ষিত।

যদি তুমি তাদের মালিকের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে তাদেরকে খুব কঠিন অন্তরের ও কড়া মেজাজের পাবে, কিন্তু যদি তুমি তাদের কাছে কোন মকসুদ হাসিলের জন্য যাও তবে তাদেরকে খুব নরম অন্তরের পাবে।

তিনি কঠোর কিন্তু অভাবগ্রস্তদের জন্য নরম যেমন পানি শক্ত পাথর থেকে প্রবাহিত হয়ে যাকে চায় ধনী ও যাকে চায় দরিদ্র করে দেয়।

তাঁর নির্দেশ মান্যকারী বন্ধুদের তিনি জীবন দান করেন ও শত্রুদের নিঃশেষ করে দেন।

ঐ “ইমাম” যখন কোন হুকুম দিয়ে দেন তাহলে বড় বড় খতিবগণও তা পালন করতে দেরী করেন না।

তিনি আমাদের সাথে চাদরাবৃত হয়ে মিলিত হন, নামায পড়েন এবং আমাদের “জাত” (সত্তা) সমূহের জন্য চাদর স্বভাবের হয়ে থাকেন।

অতএব, ঐ গুপ্ত ভেদের দিকে দেখ, যা তাঁকে “মুতি” (মুক্তা)’র মতো গহীন সমুদ্রে বিচ্ছুরিত করায়।

এমনকি তাঁর “সবুত” (চিহ্ন) অনুমোদিত হয়ে যাওয়ার উপর লোক আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় যেমন জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসলে মানুষ বিস্মিত হয়।

আশ্চর্য্য এই যে, ঐ “মুতি” (মুক্তা) কে তার ঝিনুকও লুকায়িত রাখতে পারে না। কেননা সূর্য্য অমাবস্যার অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে ধ্বংস করে দেয়। যেন এমন, যদি কোন বান্দা কোন রহস্য প্রকাশ করে তাহলে বলে, এটা আমার একান্ত বিশ্বস্ততায় লিখে রাখব।

যদি তিনি কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করেন তবে ওটা আকাশ জমিনও জানে না।

যদিওবা আমার মুখ এতে বাধাগ্রস্ত তথাপিও আমি এ ব্যাপারে কিছু বলেই ফেলেছি।

লোকে বলতে লাগল তুমি ঐ জাতেপাকের এমন সিফাত বর্ণনা করে দিয়েছ, যা আমাদের মাবুদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। এখন তুমি মাবুদে হক/আল্লাহর তারিফ কিভাবে করবে? যিনি তোমাকে লম্ব আকারে অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে কিভাবে চিনবে? যিনি তোমাকে মাতৃ জরায়ুর অন্ধকার বলয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তোমরা সত্য বলেছ। তোমরা কি সর্বস্তরে আমার বিক্ষিপ্ত অবস্থান ব্যতীত কায়েনাতের অস্তিত্বের থেকে “তাহকিকী মারিফাত” অর্জন করে ফেলেছ?

নিঃসন্দেহে এটা অন্যের মধ্যে “জাত” (অস্তিত্ব) তোমরাও আমার “জাতের” (অস্তিত্বের) “আইনে জাত” (মূল অস্তিত্ব) যখন তুমি তাঁর “অজুদের” “মারিফাত” বা পরিচিতি জ্ঞান আমার কাছে তালাশ কর, তবে তা লোকসানের সাথে বিভাজন করতে হবে।

অতপর যিনি আমার “আইন” (দৃষ্টি শক্তি) হতে “আদম” (অস্তিত্বহীন) ওটাই তাঁর “অজুদ” (অস্তিত্ব)। তাই তাঁর “জহুর” (প্রকাশক্রিয়া) “আমার এখফার” (আড়াল করণ) ভিতর “মওকুফ” (অবস্থান)।

তিনি “জাহের” (প্রকাশমান) কিন্তু ইহা তাঁর ও আমার মধ্যে “জাহের” এবং আমার “আইনে জাহের” (প্রকৃত প্রকাশ) আমার “বকা” (স্থায়িত্ব)।

যদি তিনি একাই তাঁর “তালেবের” সন্ধান করেন তাহলে অন্যের জন্য তিনি হবেন “মুতাজাস্‌সিস” (অনুসন্ধানী)।

কিন্তু এটা অসম্ভব। আমার “এখফায়ে ফানা” (বিনাশের আড়াল করণে) তাঁর অদৃশ্য প্রকৃতি তাঁর প্রকৃতি থেকে তাঁর জন্য যথার্থ। অতপর তোমার ভেতর তাঁর “এখফা” (আড়াল করণ) কখন প্রকাশ পায়। সূর্যের “জাত” (মূল)’র “এখফা” (আড়াল করণ) তার “আনওয়া” (দূর থেকে বিচ্ছুরণ)’র মধ্যে নিহিত।

দর্শনার্থীরা নিজের চক্ষের উৎপত্তি স্থলের জলাধার দেখতেই হাতের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সূর্য মেঘের পিছন থেকে বৃষ্টি পাতের জন্য আলো বিচ্ছুরণ করে তবু তার দিকে তাকালে চক্ষুগুলো অন্ধকারে ঘিরে যায়।

অতঃপর বলে নিশ্চয় তিনি নির্জনতায় আছেন এবং কিরণ বিকিরণে ব্যস্ত।

জমিনের সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধির জন্যে বৃষ্টি বর্ষণের সাথে অপরের জন্য ক্লান্ততা শ্রান্ততা নাই।
যেমন সূর্য উদিত হওয়ার সময় তার আলোতে সমস্ত আকাশে প্রজ্জ্বলিত তারকাগুলোর আলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।
অতপর যখন সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ার কিছু সময় পার হয় তোমার দৃষ্টিনন্দিতকরণে তারাগুলো আকাশে পূর্ণ প্রকাশ পায়।
মূলগত, জীবন ও মরণ দু'টার জন্য এটাই নির্দেশনা। অতঃপর তার “এখফা” (আড়ালকরণ) আমার থেকেই প্রকাশ পায়, তাঁর প্রকাশ তাঁর থেকে পায়, মুখের মধ্যে ঠোঁটদ্বয়ের একাত্মতা।
আমার “এখফা” (আড়ালকরণ) তাঁর কারণেই হয় এবং আমার প্রকাশের আলো আমার কারণে হয়। অর্থাৎ তাঁর আলো আমার চোখ অতপর আমি বিপরীত ঠোঁটগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় তাঁর পরিচিতি অপরিসীম। বরং “আয়ান” (দরশন প্রক্রিয়া)’র ধারায় উভয়ই অভিন্ন। যেভাবে নির্মল/স্বচ্ছ কাঁচের বোতলে স্বচ্ছ শরাব।
এলম বা জ্ঞান রচিত বস্তুর একাত্মতার সাক্ষী এবং চক্ষু দর্শনার্থীকে শুধু এটি প্রদর্শন করায়।
অনুরূপ “রুহ” (আত্মা) নিজ সৃষ্টিকর্তা হতে এবং নিজের অন্তমিল বর্ণ পরিবর্তন করে নিজের “জাত” (সত্তা)’র মজা গ্রহণ স্থলে পরিণত হয়।
ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও আপন রব থেকে মজা অর্জন করে এবং অনুগ্রহের অনুভূতিতে ধ্বংসশীল হয়।
অতএব আল্লাহ্ তায়ালা অনেক মহান, তাঁর মহানত্ব আমার “রেদা” (চাদর), তাঁর “নূর” (আলো) আমার “বদর” (গতি) তাঁর “জিয়া” (জ্যোতি) আমার “জখা” (বুদ্ধিমত্তা)।
তাঁর প্রাচ্য আমার প্রাচীচ্য, তাঁর প্রাচীচ্য আমার প্রাচ্য, তাঁর দূরত্ব আমার নিকটত্ব, তাঁর নিকটত্ব আমার দূরত্ব।
“আগুন” (দোজখ) আমার অদৃশ্যতা, “স্বর্গ” (জান্নাত) আমার প্রত্যক্ষতা, নিত্য নব সৃষ্টির উৎসগুলো আমার অনুগত।
যখন তুমি আমার বাগানে আনন্দ ভ্রমণ করতে চাও তখন আমার ভিতরে সমস্ত সৃষ্টির উপস্থিতি পাবে।
যখন আমি নেতৃত্ব হতে মুখ ফিরিয়ে নিব তখন এমন কোন ব্যক্তি হবে না, যে আমার পরে আমার খিলাফতের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
আল্হামদুলিল্লাহ্! আমি সৃষ্টিকৃত, আবার সৃষ্টিকারী, উভয় অবস্থার হাকিকতের “জা’মে” (সমাবেশ স্থল)।
তাদের জন্য আমার এই কবিতা “আজিব” ও “গরিব” সকল কিছুর “মাজহার” যারা বড় বড় “ফাসাহাত” ও “বালাগাতে”’র প্রবক্তা।
হে আব্দুল আজিজ! আমরা দু’জন মিলে আপন পালনকর্তার এটাই শুকরিয়া আদায় করব। তাঁর সাথে এই “আজরা” (কৌমার্য্য)’রও শুকরিয়া আদায় করি।
কেননা শরিয়তীভাবে আল্লাহ্ তাবারাক তায়ালা এটাই হুকুম। যেন আমরা আল্লাহ্ শুকরিয়া আদায় করি ও পিতা মাতার শুকরিয়া আদায় করি, এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত।

(প্রারম্ভ করি) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রশংসার পর, যে এমন কোন প্রশংসা যা প্রশংসা হতে বাদ পড়ে না। বা করা যায় না এবং ঐ “জাতে আকদস” (পবিত্র সত্তা)’র উপর সমস্ত সালাত-সালাম, যাকে ভ্রমণ করানোর জন্য নিজে “এস্তাওয়া” (বিশ্ব মেরুর মধ্যধাম উর্ধ্ব) স্তরের উর্ধ্ব নিয়ে গেলেন।
হে জ্ঞানশিষ্টগণ, বন্ধু বান্ধবগণ! জেনে রাখ যখন “হাকিম” আপন সাথী হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং উভয়ের মধ্যে কালচক্র আড়াল হয়, তখন তাঁর জন্য আবশ্যিক যে, তিনি নিজের বন্ধুকে সকল কথা জ্ঞাত করানো যা তিনি তাঁর থেকে ভিন্ন হওয়া অবস্থাতে আপন নির্ণয়কৃত বন্ধু এবং তার (বন্ধুর) “আদমে মওজুদ” (অনুপস্থিতি) অবস্থায় ঘটিতব্য কলাকৌশলের গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া। যেন তাঁর বন্ধুর কাছে এর প্রহেলিকা, পরিচিতি, নির্দেশনাগুলো সানন্দে উপার্জিত হয়ে যায়। যা দয়াময় মহিমাম্বিত খোদা তাঁকে দান করেছেন এবং যেই কালামাত/কথাবার্তা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেন এমন অনুভব হয় “তাঁর বন্ধু তাঁর থেকে পৃথকই হয়নি”।
এ জন্যই তাঁর বন্ধু তাঁর থেকে কিছু কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুকে স্থায়ী করুন। এমতাবস্থায় এ সকল কিছু বলে দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে কারণ, যখন ঐ বন্ধুর অন্তরে বন্ধুত্বের একান্ত বিষণ্ণতা ও কাঠিন্যতা সৃষ্টি হয়েই গেছে।
যাই হোক! তাঁর বন্ধু তাঁর থেকে যাচাই বাছাইয়ের চক্ষু বন্ধ করে নিয়েছেন এবং বন্ধুর ব্যাপারে তাঁর একান্ত আত্মবিশ্বাস অর্জন হয়ে গেছে। কেননা তোমার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি যত্নবান হবে যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে।
অতঃপর আল্লাহ্ ঐ বন্ধুকে স্থায়িত্ব দান করেন। তাঁকে মোবারকবাদ তাঁর “কুলব” সংরক্ষিত প্রথম থেকেই তাঁর প্রেম ছিল “দায়েমী” “কায়েমী”।
আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে স্থায়ী করুন। তিনি (আল্লাহ্) জানেন তাঁর (ঐ বন্ধুর) প্রেম, উদ্দেশ্য এবং খাহেশাতের উপর স্থাপিত নয়।
বরং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য। কোন কারণ ছাড়া প্রাগৈতিহ্যভাবে তাঁর দিলে স্থাপিত ছিল। সংযোজন বিয়োজন হয়না। কোন শাস্তি বা পুরস্কারের আশায় বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে না।
আল্লাহ্ তায়ালা আমার ঐ বন্ধুর হিফাজত করুন। আমি প্রথম তাঁর দিকে ৫৯০ হিজরী সনে সফর করেছি। যখন আমার দিকে তাঁর “আদমে এলতেফাত” (অনন্তিম বন্ধু) ছিল এবং আমার মাকুসুদ ও মাজহাবের উপর চলার প্রতি তিনি বিষন্ন ছিলেন।
কেননা তিনি এতে ক্ষতি দেখতে পাচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর সম্ভ্রষ্ট থাকুন, আমি তাঁকে এ ব্যাপারে সম্মানী দেখেছি।
তিনি যা কিছু বুঝতেন তা আমার বহির্গত প্রকাশ্য অবস্থার মুশাহেদা ছিল কেননা আমার উপর যে অবস্থায় প্রকাশ পেত তা আমি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থেকে গোপন রাখতাম এবং আমার মন্দ অবস্থা ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতাম।
অধিকাংশ সময় তাঁকে সতর্ককরণার্থে কিছু না কিছু প্রকাশ করে দিতাম, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তায়ালা অনুমতি ছিলনা। তৎমধ্যে কেউ আমার দিকে ভাল দৃষ্টিতে দেখেছে।
একদিন ঐ বন্ধু কোন এক মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। আমি তা

শ্রবণ শক্তিকে হতচকিত করতে নিম্নোক্ত শে'র পাঠ করলাম।

আমি কোরআন ও সপ্ত আসমান, আমি রুহ সমূহের রুহ শরীরের রুহ নই।

আমার অন্তর আমার অনুভূতির উপর নির্বাচিত এবং তাঁরই মুশাহেদা করে। তোমাদের দিকে আমার মুখ।

তুমি নিজ দৃষ্টি দিয়ে আমার শরীরকে দেখনা এবং অফুরন্ত নিয়ামত ভাণ্ডার হতে পলায়ন কর।

তুমি “জাত” সমূহের “জাত” এর সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হও তবে এমন আশ্চর্য্য দৃশ্যাবলী দেখবে যা কারণানুপাতে ব্যক্ত হয়।

এবং এমন রহস্যাবলী দেখবে যা অস্পষ্ট দৃশ্যত হয় “রুহুল মায়ানী” (প্রাণ শক্তি) আবৃতাবস্থায়।

আল্লাহ'র শপথ! যখন আমি এই ঘটনা থেকে একটি শে'র পাঠ করেছি, আমার মনে হলো যেন কোন মৃতকে শোনাচ্ছি বা কোন মৃত ব্যক্তি শুনেছে এবং তার ভিত্তির এমন হেকমত ছিল যার সন্তুষ্টি আমায় কামনা করে এবং নফসে ইয়াকুবের প্রয়োজনীয়তা ছিল যা তিনি পূরণ করে নিলেন।

আমাকে এই সম্মানিত মজলিশের মর্যাদাময় সমাবেশে তাঁর ব্যক্ত কথক ও মোকাদ্দিম (প্রারম্ভিকা) আবু আব্দুল্লাহ বিন মোরাতেব অনুভূত করালেন কিন্তু এই অনুভূতি পরিপূর্ণ ছিল না। বরং এতে “তাকদিরী” সংশয় ও অস্পষ্টতা সম্পৃক্ত ছিল।

অবশ্য মরহুম শেখ মুসসিন জররাহ'র সম্মুখে আমি সম্পূর্ণ বেফাঁস হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তার সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম, আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদের পর তাঁকে ছেড়েছি।

আল্লাহ'তায়াল্লা নিজের জিকির এবং আপন অবস্থা সমূহের উপর শোকর করার জন্য তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং ঐ কথাকেও কায়েম রাখলেন, যিনি তাঁর কৃতিত্ব সমূহ বর্ণনা করেন ও তাঁর শিষ্টাচারের প্রেমিক হন।

কোন সময় আমি যখন ঐ বন্ধুর বিষয়ে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি তখন বাহকের মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হল এবং বন্ধুও এই নির্দেশনার ব্যাপারে জ্ঞাত হলেন।

আমার বিশ্বাস এই “কারণের” প্রয়োজনের পূর্বেই (তাঁর সঙ্গে) আমার প্রেম তাড়াতাড়ি কিংবা বিলম্বে তাঁর উপর অটল হয়ে গেল।

এতদসত্ত্বেও সেটা তিনি নিজের জাতে স্থিত রাখেন আবার ছেড়েও দেন।

আল্লাহ'তায়াল্লা আমার বন্ধুকে নিজের বন্ধু বানিয়ে রেখেছেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর তার স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কিছুদিন পর নয় মাসের ভোগ বিলাসময় উদ্যানে শরীর, আত্মার প্রেম উল্লাসে তার দিকে পৌঁছলাম এবং আমাদের মধ্যে সকলেই আপন বন্ধুর জন্য একাত্মচিত্ততার প্রচেষ্টা করেছি।

তিনি আমারও বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরও বন্ধু ছিলেন এবং আমাদের দু'জনেরই বন্ধু আবু আবদুল্লাহ বিন মোরাতেব ছিলেন যিনি একজন কলন্দরী বুজুর্গ। সর্বক্ষণ তাসবিহ তিলাওয়াতে সময় অতিবাহিতকারী।

এবং আমার বন্ধু আবদুল্লাহ বদর হাবসীও ছিলেন। আল্লাহ

তাঁকে “খসফ” (চন্দ্রগ্রহণ) লাগা থেকে বাঁচিয়েছেন।

তিনি স্পষ্ট জ্যোতি ও সম্পূর্ণ নূরানী ছিলেন। সৈনিক “সাহেবে মানাজিল” বা স্তর সমূহের ধারক ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে জ্ঞাত। নিজ অবস্থার বিচারক। সত্য মিথ্যার প্রভাবকারী।

নিজ পরিজনের কর্তব্যে কর্তব্যপরায়ণ হক/অধিকার গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বি না হয়ে সামঞ্জস্যতাকারী ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্রতার স্তর অর্জনকারী এবং বিগলিত খাঁটি স্বর্ণ সদৃশ্য।

তাঁর কথা সত্য ও প্রতিশ্রুতি সত্য, অতপর আমরা চারজন “আরকান” (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা) হই।

অতঃপর ওখানে সৃষ্টিতব্য কিছু অবস্থার উপর আমরা পৃথক পৃথক হয়ে গেলাম এবং এখনো পর্যন্ত ঐ অবস্থায় আছি।

এরপর আমি হজ ও ওমরার নিয়ত করেছি এবং দ্রুত গতিতে ঐ মর্যাদাময় সমাবেশের দিকে চলতে লাগলাম। “উম্মুল কোরা” নামক স্থানে পৌঁছে আপন “খলিল” [ইব্রাহিম (আ.)]'র সাক্ষাতে ধন্য হলাম। যিনি খানা মেজবানীতে সুলতের মর্তবা দিয়েছেন।

তারপর আমি “সাকরা” ও “আকসা”য় নামায আদায় করলাম এবং আমার ও সকল আদম সন্তানের সর্দার, (সৃষ্টিকে) “প্রেমজালে পরিবেষ্টনকারী” [মুহাম্মদ (দ.)]'র সাক্ষাত লাভে সিক্ত হলাম।

তারপর আল্লাহ' তায়াল্লা আমার অন্তরে জাগ্রত করে দিলেন যে, মারিফাতের ঐ জ্ঞান আমার বন্ধুর খেদমতে পেশ করব যা আমি তার থেকে পৃথক হওয়ার পর অর্জন করেছি।

এবং জ্ঞানে ঐ “জাওয়াহের” গুলোর হাদিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি যা আমি ভ্রমণাবস্থায় অর্জন করেছি।

অতএব আমি এমন কিতাব রচনা করেছি যাকে আল্লাহ' তায়াল্লা “জাহেলিয়াত” (অন্ধকারত্ব) হতে মুখ ফিরানোর জন্য “তাবিজ” বানিয়ে দিয়েছেন।

(কিতাবটিকে) ঐ বন্ধু ছাড়া, প্রত্যেক মুখলেস বন্ধুগণ, সুফিগণ, অলিগণ ও আমার প্রিয় বুঝ সম্মত সৎ চরিত্রবান বন্ধু আবদুল্লাহ বদর হাবসি ইয়ামনী, মুক্তিপ্রাপ্ত আবুল গানায়েম ইবনে আবিল ফতুহ হরানী'র জন্য আল্লাহ' বিশেষ উপকারী করে দিয়েছেন।

আমি এই কিতাবের নাম “ফতুহাতে মক্কিয়া ফি মারেফাতে আসরারীল মালেকীয়া ওয়াল মুলকিয়া” রেখেছি। এটা এই জন্যই যে, এই কিতাবে আমি অধিকাংশ ঐ কথাই বর্ণনা করেছি যা আল্লাহ' তায়াল্লা আমাকে বায়তুল মোকাররমের তাওয়াফ ও “হেরম শরিফে” মোরাকাবা অবস্থায় দান করেছেন। এটাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে অনেক বুদ্ধি বিবেচনায় ভরপুর করেছি, কেননা যতক্ষণ মানুষ নিজের শেষকে না জানে ততক্ষণ তার গুরুর সমস্যাগুলো বুঝা সহজ হয়ে ওঠেনা। বিশেষ করে যখন সে প্রথমের মজা পেয়ে যাবে তখন তাকে নিজের শেষ এবং ইচ্ছা বানিয়ে নিবে।

যখন কারো চক্ষুর দরজা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখনই তার অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি “জাওহার” “মুতি” (মনি মুজা) বের করতে থাকে।

‘আয়নায়ে বারী’ কিতাবের ভাবার্থ

● এস এম এম সেলিম উল্লাহ ●

[মাইজভাণ্ডার শরিফের তাসাওউফ ধারা সম্পর্কে ধারণাপ্রাপ্তি সম্পর্কিত বিস্ময়কর গ্রন্থ হচ্ছে ‘আয়নায়ে বারী’। মূল গ্রন্থ আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে কাব্যিক ধারায় লেখা। গ্রন্থের লেখক বাহারুল উলুম মাওলানা সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী হলেন হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র অন্যতম খলিফা এবং জ্ঞান অশেষী বুজুর্গ। মূল ভাষায় প্রকাশের পর থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ না হওয়ায় এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনেকাংশে আরবি-ফার্সি ভাষা জানা ব্যক্তিদের মতামত ও ব্যাখ্যার উপর ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পাঠকদের একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে আলোকধারা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের লক্ষ্যে কয়েকবার উদ্যোগ নেন। অবশেষে মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ গ্রন্থটির কাব্যরীতি ঠিক রেখে বাংলা ভাষায় অনুবাদের সূত্রপাত করেছেন। গ্রন্থটির অনুবাদ মাসিক আলোকধারায় প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। –সম্পাদক]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৫ম কিস্তি)

গজল

এমন বসন্তকালে কেমনে শুভা ত্যাগ করিব
 প্রেম শরাব পান করিয়ে, সর্ব জঞ্জাল মীমাংসিব।
 * যোহদ তাকওয়া ইলম আরো, গায়কগণ কই রহিল
 বাদ্য আর কণ্ঠের আওয়াজে, নিজেকে ফেদা করিব।
 * যাহেদের যোহদ ও ইলম দীল আমার হয় বিরক্ত
 মাণ্ডকের সেবায়তে হয়ে মনোপ্রাণে শরাব পি-ব!!
 * মীরে মায়খানার কাছে দীলের থেকেই মুরিদ হব
 প্রেম শরাব পান করিয়ে আহ্ উহ্ চিৎকারিব।
 * পীরে মায়খানার সেই কলেমা আমি পড়ে নিব
 শরাবীদের সঙ্গে মিশে, বাকি জীবন পার করিব।
 * প্রেম নেশা বর্ধক হইয়া পূর্ণপাত্র দাও হে সাকী
 যেন এই রাজ সিংহাসনের গল্প সর্বদা করিব।
 * গাউসে খোদা মকবুল বেদীল’পর দৃষ্টিদিন আজি
 যেন একবার ভাগ্যালিপি, সৌভাগ্যময় করেই নিব ॥
**প্রথম জলোয়া বা দুতি: এখানে হযরত গাউসে পাক (ক.)’র
 হাল সমূহ বর্ণনা করা হল :**
 এখানে সাত পরতু বা রশ্মির প্রথম পরতু বা রশ্মিতে হযরত
 গাউসে পাক (রা.)’র আবির্ভাবের রহস্যময় স্বপ্নের বর্ণনা খোদা
 বন্দে পাকের হাবিব হযরত গাউসে পাক (রা.)’র সুউচ্চ শান
 মর্যাদা বর্ণনাকারীর বর্ণনার বহু উর্ধ্বে। সূর্যের দিকে খোদ তার
 কিরণই পথ প্রদর্শন করে। **শ্লোকার্ধ : “সূর্য নিজেই সূর্যের
 দলিল”।**

পৃষ্ঠি

শুণীগণ করুক না করুক তব গুণের গুণগান
 পরিচারিকার কিবা দরকার করিতে দীলে আরাম দান,
 জাতিগত আদি জ্যোতি যারে দিলেন প্রভু দয়াগুণে
 অলংকার ও গয়না-গাটির কামনা তাঁর কি প্রয়োজনে।

গজল

কে জানিবে গাউসুল আযমের কোথা অবস্থান,
 দৃষ্টি ও বুঝ শক্তির উর্ধ্বে জানিবে কেবল মানি জন।
 জাহেরেতে বান্দা যেন রাজ রহস্যের কি কখন,
 দৃঢ় বিশ্বাস খোদাই শুধু জ্ঞান আছেন যার বাতন।
 কেউ জানে না রহস্যের মূল মানব কি বা দেবগণ,
 খোদার ঐশীত কেবল খোদ খোদা খোদ জ্ঞাত রন।
 সূর্যের বাস্তবতা যেমন নিজ কিরণে বিরাজমান,
 জেনে রাখ গাউসুল আযম রূপে খোদ তিনিই বিকাশমান।
 অনন্ত সাগর হয় তাঁর সত্তা তরঙ্গ হয় দু’জাহান,
 সেই সম্মানি বুঝে আসেনাই যেন হন তথায় নিমজ্জন।
 গর্বে আজি মকবুলের শির করবে আরশ উর্ধ্বে গমন,
 তব আস্তানার পাক মাটির জানিবে হয় কি সম্মান।
 অতএব, আহমদী সে সৌন্দর্য মূলে উৎসর্গিত প্রেমিক ও
 প্রেমাস্পদের স্থায়ী প্রেমিকাদের জন্য গাউসে পাকের স্মরণই
 ব্যথিত হৃদের ঔষধ। বরং তাঁর গাউসিয়তের প্রশংসা বর্ণনা
 অন্তরের অন্তস্থলের বিষয় ও তার স্মরণ ঈমানের মগজ ও
 একিনের প্রতিপাদ্য সারবস্তু।

পৃষ্ঠি

গাউসে মাইজভাণ্ডারীর শ্রেষ্ঠত্বের আরশি রবি থাকবে চিরকাল,
 বারংবার আসবে সেবাদানে সেবকদল সহ জিব্রাইল।
 ব্যথিত ব্যাকুল হৃদের প্রশান্তি হয় এর স্মরণে,
 তব নামের সহায়ে শান্ত প্রেম তাড়নায় অস্তির দীল।

গজল

ওহে প্রাণের প্রাণকর্তা, প্রাণের ভিতর গুপ্ত তুমি,
 সৌন্দর্যের রাজাধিরাজ তুমি, প্রাণ সমূহের প্রাণ তুমি।
 শুরু কিবা শেষ তুমি, গুপ্ত কিবা ব্যক্ত তুমি,
 কুল আলমের বাদশাহ্ তুমি মানব চক্ষু মানুষ তুমি।
 প্রেমিকের দীলের যাতনা বিরহ বেদনা তুমি,

ব্যথিত হৃদের কাঁদনে ব্যথার মহৌষধ তুমি ।
লাইলি আর মজনু তুমি, ফরহাদ এবং শিরি তুমি,
প্রেমাস্পদের রূপ খড়্গ, বাঁকা নয়ন ধার তুমি ।
ফুল বাগানের ফুল তুমি, বুলবুলিদের মনোহারী,
বাগানের ঐ বুলবুলিদের বিলাপ সুরের মর্ম তুমি ।
ব্রাহ্মণের পইতা যাহেদের তসবি তুমি,
কাবা আর ভূতখানাতে গুপ্ত আর ব্যক্ত তুমি ।
মনের ঐ রত্ন ভাণ্ডারে লাল ইয়াকুত রত্ন তুমি,
তরঙ্গ ও সাগর তুমি, তথায় উজ্জ্বল ঐ মুক্তাও তুমি ।
গাউসে মাইজভাগুরীর বেশে মনোপ্রাণ হরণকারী,
অনাথের নাথ আর আশ্রয় ও সম্বল তুমি ।
মকবুলের দীলে নিজেই আসনে সমাসীন তুমি,
এক নজরে প্রাণস্থানে প্রাণে মিশে গুপ্ত তুমি ।
এখন সংক্ষিপ্তসারে হযরত গাউসুল আযম নূরে আলম কুতুবে
আফখম, রাদিয়ানুল্লাহুল আকরম এর কিছু হাল বা অবস্থার
বর্ণনা শুনুন এবং নিজের জীবনের সারবস্তুকে তাঁর ঐ ঈমান
বৃদ্ধিকারী সুগন্ধে সুগন্ধিত করুন । একিনের দৃঢ়তা বৃদ্ধিকারী
সুস্বাণে দীলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সুস্বাণিত করে নিন ।
হযরত বেলায়তে এনতেসাব গাউসিয়তে মা'য়াব রাদিয়া আনহ
রাব্বুল আরবাব এর ফয়েজপ্রাপ্ত ছোট ভাই মৌলভী শাহ সৈয়দ
আবদুল করিম (মা. জি আ.) বর্ণনা করেন, আমি আমার
সম্মানিত মহান পিতা যিনি আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাত ওয়াহদাতের
পোশাকধারী জনাব ফয়জে এনতেসাব মৌলভী শাহ সৈয়দ
মতি উল্লাহ (ক.) হতে শুনেছি, তিনি বর্ণনা করেছেন যে,
হযরত গাউসুল্লাহিল আযম ফরদুল্লাহীল আকরম মাইজভাগুরী
(ক.) যিনি বেলায়ত, গাউসিয়ত, কুতুবিয়তের ধারক, বাহক ও
নিশানধারী তাঁর দুনিয়ায় আবির্ভাবের পূর্বে এক রাত্রে আমি
এশা নামাযের পর রাতের অযিফা পাঠ শেষে আপন বিছানায়
শায়িত হয়ে আরাম করছিলাম এবং মলকুতে আলা বা
ফেরেশতা জগৎ উর্ধ্ব আমার ভ্রমণ শুরু হল । এ সময় আলমে
মেছাল বা দৃষ্টান্ত ভূবনের সকল দরজা খোলা অবস্থায় আমার
দৃষ্টিগোচর হল । হাকিকতে মোতলাকা (উন্মুক্ত একান্ত
স্বকীয়তাপূর্ণ) তিনটি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ অর্থাৎ আলোক উজ্জ্বল
বাতির রূপধারণ করা অবস্থায় আমার নজরে আসল এবং
আমাকে যেন এই হাকিকতের রহস্য জানান দিচ্ছে যে,
“আল্লাহ নুরুছছামা ওয়াতি ওয়াল আরদি মাছালু নুরিহি কা
মিশকাতিন ফিহি মিজবাহুন আল মিজবাহু ফী জুজাজাতিন ।”
অর্থাৎ “আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি । তাঁর এই
জ্যোতির উপমা হচ্ছে, তাকের উপর একটি প্রদীপ । প্রদীপটি
কাঁচের আচ্ছাদনের মধ্যে । কাঁচের আচ্ছাদনটি নক্ষত্রের মতো
উজ্জ্বল প্রদীপটি জ্বলে পবিত্র জায়তুন গাছের তেলে । এ
জায়তুন গাছ প্রাচ্যের নয়, পাশ্চাত্যের নয় । আগুনের স্পর্শ
ছাড়াই তেল আপনা-আপনি প্রজ্জ্বলিত থেকে আলো বিকিরণ
করছে । জ্যোতির উপর জ্যোতি (সূরা নূর : ৩৫) । আল্লাহ
তাকে তাঁর জ্যোতির পথ প্রদর্শন করেন । আল্লাহ এভাবেই
উপমা দিতে মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন । এ সকল বিষয়ে আল্লাহ

সম্পূর্ণ “ওয়াকিবহাল”- বরং আমার এমন অবগতি হতে
লাগল তিনটি প্রদীপের মধ্যে একটি জ্যোতি অপর দু'টি থেকে
এমন সুউজ্জ্বল যে, যেমন নক্ষত্র ও চন্দ্রের তুলনায় দীপ্তিময়
সূর্য । এই প্রদীপের এমন ত্যাজধর জ্যোতিতে আরশ-ফরশ,
আসমান-জমিন, ফেরেশতা জগৎসহ সমগ্র জাহান আলোকিত
হল ।

এই মহামূল্যবান স্বপ্ন হতে এমন অবস্থায় জাগ্রত হলাম যে,
দীলের আনন্দ ফুর্তিতে উদ্বেলিত হয়ে আনন্দে এমন আত্মহারা
হওয়ার উপক্রম হলাম যেমন “ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বুল লিল
জাবালি জায়ালাহু দাক্বাওঁ ওয়া খাররা মুসা ছাঈকান” । অর্থাৎ
অতপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে মহিমার উজ্জ্বল দ্যোতি
প্রকাশ করলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল এবং মুসা
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল- (সূরা : আরাফ-১৪৩ আয়াতাতংশ)
উপর্যুক্ত আয়াত হচ্ছে একটি বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা ।

গজল

স্বপ্নে নামি জাগরণে একি হেরিলাম নয়নে,
নাকি এটা মনের দ্বন্দ্ব না দেখেছি ঐশী ধ্যানে ।
এটা নাকি সত্যের প্রদীপ না আঁধার রাতে পথের দিশা,
নাকি রহমতের ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত এই গগনে ।
নাকি খোদ নিজেই এলেন ধরিয়ে এই হল-বাহানা,
নাকি রহস্যলিপির নূর ও কিরণ হেরেছি মোর এ নয়নে ।
স্বর্গীয় সে দেবগণের ঝলোয়া নাকি খোদার দয়া,
নূর ক'বা না দীপ্ত তারা এসেছে মোর আঁখি পানে ।
আকাশের ঐ সূর্য নাকি এটা আরশের দীপ্ত প্রদীপ,
দেখছি নাকি গাউছে মাইজভাগুরীর মুখজ্যোতি পানে ।
নিজের জ্যোতি নিজে দেখে নাকি মকবুল পাগল হল,
খোদার তাজাল্লীর ঝলক যে জনে বারেক দেখে নে ।
ভোর হলে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে অভিজ্ঞ রহস্য জ্ঞানী অন্তরঙ্গ বন্ধু
জনাব মৌলভী আবদুল হাদী প্রকাশ হাঁড়ী চাঁন্দ মিয়াজির (র.)
কাছে গেলাম এবং তাকে সম্পূর্ণ স্বপ্ন খুলে বললাম ।
ভাবোদ্যানের বুলবুলি ঐ রহস্যময় স্বপ্নের কথা শুনামাত্র
বাকরুদ্ধ অনুরোধের অনুরাগে বলে উঠলেন “লা তাক্বসুস
রু'ইয়াকা আলা ইখওয়াতিকা” অর্থাৎ আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্ত
ভাইদের নিকট বর্ণনা করবেন না-সূরা ইফসুফ-৫ এর সতর্ক
সংকেত উল্লেখ করে বললেন, দেখুন! এমন সৌভাগ্যময়
মঙ্গলজনক কর্ম সম্পাদনকারী স্বপ্নকে আজেবাজে স্বপ্নের মত
অবুঝ, অযোগ্য ও যারা এটির আহাল নয় তাদের কর্ণগোচর
করবেন না । এই সৌভাগ্যময় রহস্যপূর্ণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে,
আপনার পবিত্র নসলে এবং মহান বংশে কল্যাণময়ী খোদার
পরশ দয়ানুগ্রহে এমন মুক্তার মত বা উজ্জ্বল প্রদীপ সদৃশ্য
তিনজন সুসন্তানের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে দু'জন হবেন
অত্যন্ত পূণ্যবান ও খোদার মারেফাত জ্ঞাত এবং সৎ লোকের
ঔরসে সৎ সন্তান” কথাটির হাকিকত আল্লাহ বাস্তবায়ন করে
দেবেন । অপর একটি এমন অদ্বিতীয় অতুলনীয় মুক্তা আপনার
সমুদ্রময় নসলে পাক হতে জগতে আবির্ভূত হবেন, যার
মুখমণ্ডলীয় জ্যোতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বনিম্ন সমস্ত জগৎকে

আলোক উদ্ভাসিত করে দেবেন। জগৎ সমূহ উজ্জ্বলকারী এমন এক সূর্য আপনার ঔরসপাক হতে জগতে পদার্পণ করবেন, যাঁর সৌন্দর্যময় কিরণে খোদার সমস্ত খোদায়ীকে আলোক উজ্জ্বল ও প্রামাণ্যময় করে দেবে।

পৃথক্

জগৎ ভরে পরীমুখ নিজ রূপের গর্ব করা,
মম প্রাণপতি রূপে সুন্দরে খোদু পাগলপারা।
আল্লাহ্! আল্লাহ্! একি অপরূপ উন্মুক্ত রূপধারা,
রবি-শশী, গ্রহ-তারা হয়ে যায় নিজ জ্যোতিহার।

গজল

তব রূপ ঝালোয়া হতে ফয়েজ ধারা জারি হল,
তোমা হতে বসুন্ধরায় বসন্তের ফয়জ নেমে এলো।
আরশ ফরস্, গ্রহ-রাশি, জল, জলস্থ জলবাসী,
জীন ইনসান হুর্ ফেরেশতা সবই, তোমাতে উৎসর্গ হল।
ফয়েজের মূল উৎস স্বয়ং, তোমারই পবিত্র সত্তা,
তন অজুদের কৃপায় গড়া ফয়েজের ঐ কেন্দ্রস্থল।
নিজ মোরাদের মুখছবি, দেখবে না কেউ কোনকালে,
যে অবধি মুখপর্দা ফয়েজগুণে দূর না হল।
বিশ্বের যত পুণ্য আত্মা কাতার বেঁধে সারি সারি,
রুহানী ফয়েজের আশায় সবে অপেক্ষমান রইল।
(ওহে) মকবুল তাঁর সত্তাই মহামূল্য দয়ার বৃক্ষ,
শাখা-পত্র সুবিস্তীর্ণ বৃক্ষ পূর্ণ ফয়েজের ফল।

ফলাফল: “নাকরা” নামক তাফসির গ্রন্থে সূরা ইফসুফের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, হযরত ওমর বিন খাতাব (রা.) তাঁর খেলাফতাবস্থায় একদিন আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী কাররামাল্লাহুর সাক্ষাতের জন্য সসম্মানে তশরিফ আনলেন এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহুর ওয়াজহাহুর কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। প্রথম প্রশ্নটি হল, অনেক সময় দুই ব্যক্তি বন্ধুত্ব করে ও প্রেমপ্রীতি, ঘনিষ্ঠতা, প্রেমনিষ্ঠতায়, একে অপরের সম্পর্কের স্তর প্রকাশ পায়। অথচ ইতোপূর্বে কখনো উভয়ের মধ্যে এহসান বা উপকারের পূর্বসূত্র ছিল না। এটার কারণ কি? এবং কখনো দুই ব্যক্তির মধ্যে একে অপরের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং বৈরিতার সাথে একে অপরের সম্মুখীন হয়। অথচ ইতোপূর্বে কখনো একে অন্যের অনিষ্টকারী ছিল না।

হযরত আলী কাররামাল্লাহুর ইরশাদ করলেন, আমি হযরত রসূলে খোদা (দ.) হতে এমন শুনেছি যে, ‘মি’সাক’ বা প্রতিজ্ঞা দিবসে (আল্লাহ্) যখন সকল আদম সন্তানকে তাঁর পৃষ্ঠদেশ মোবারক হতে বের করে দাঁড় করালেন, (তখন) তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে অন্যের সামনা সামনি ও মুখোমুখি হলেন। আর কেউ কেউ পিঠা-পিঠি বিরাগ পূর্ণাবস্থায় খাড়া হয়েছিলেন। অতএব, যারা মুখোমুখি ছিল এই দুনিয়াতে তারা একে অন্যকে চেনে ও নিজেদের মধ্যে দোস্তী মোহব্বতকে সুদৃঢ় করে এবং

যারা পিঠাপিঠি বিরাগ পূর্ণাবস্থায় খাড়া হয়েছিল এই দুনিয়াতেও এটার প্রভাব প্রকাশ পায় এবং শত্রুতা ও অনিষ্টকারী হিসেবে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কখনো মানুষ কোন কথা শুনলে তা স্মরণে থেকে যায় আবার কোন কোন সময় কথা শুনলেও তা ভুলে যায়। হৃদয় থেকে এই স্মৃতি লোপ হয়। এটার কারণ কি? আমিরুল মু’মিনিন হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি রসূলে মকবুল (দ.) হতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন দীলের মধ্যে অনেক পর্দা রয়েছে, যখন অন্তরের সে পর্দাগুলো তুলে নেওয়া হয়, তখন যা শুনে তা স্মরণ থেকে যায়। আর যখন ঐ পর্দাগুলো দিয়ে অন্তরকে ঢেকে দেয়া হয়, তখন কোনো কথা শুনলেও ভুলে যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে কখনো কখনো ঐ স্বপ্ন বাস্তবে প্রকাশ পায় আবার কখনো কখনো বিপরীত হয় এটার কারণ কি? হযরত আলী কাররামাল্লাহুর বললেন, আমি শুনেছি, রসূল (দ.) ইরশাদ করেছেন যে, কোন মানুষ এমন নয় যার রুহ স্বপ্ন দেখার সময় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয় না এবং উর্ধ্বে আরোহনের সময় ও নিম্নে অবতরণের সময় (রুহ) অনেক কিছু দেখে থাকে। যা কিছু আসমানের নিচে দেখে তাতে শয়তানের আয়ত্ব ও প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য থাকে। তাই তা দেখা বিষয়ের বাস্তবতার বিপরীত হয়। আর যা কিছু আসমানের উপরে আরোহী অবস্থায় দেখে এটাতে শয়তানের প্রভাবের উপায় নাই। তাই তা দেখা অনুরূপ বাস্তবে পরিণত হয়। যখন আমিরুল মু’মিনিন হযরত ওমর (রা.) প্রাণবন্ত উত্তর পেলেন তখন হযরত আলী (রা.)’র অনেক প্রশংসা করলেন ও আল্লাহুর শুকরিয়া আদায় করলেন। হাদিস শরিফের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল্লা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন যাকে “ফেরেশতায়ে খা’ব” বা স্বপ্নের ফেরেশতা বলে। যে ফেরেশতার চোখ হযরত আদম (আ.)’র যুগ থেকে জগতের মহা প্রয়াণত্বক সকল মানবের চোখ সমান চোখ রয়েছে। এই চোখগুলো এ জগতের দিকে উন্মোচিত এবং তার অন্য এক চোখ এত বড় যে, এটার প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিস্তৃতি ও পরিব্যপ্ততার সমান। এটা লৌহে মাহফুজ ও আরশে আজিমের দিকে উন্মোচিত এবং এটি দ্বারা আদম সন্তানদের প্রত্যেকের নামে যা কিছু লিখা আছে এ সকল পড়েন। আর যে চোখ দিয়ে প্রত্যেক মানুষের দিকে চেয়ে রয়েছেন, এটি দ্বারা তাদেরকে স্বপ্নে দেখানো লৌহে মাহফুজ ও আরশে আজিমের লিখনি এমন কি সুখ-দুঃখ সবকিছু প্রকাশ পায়। অতএব, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা মু’মিন হয় তবে এই স্বপ্ন হয় তার জন্য কারামত। আর যদি কাফের হয় তবে এটা তার জন্য অপবাদ যুক্ত হওয়ার প্রমাণ। মু’মিনকে যে খুশি আবশ্যিক ও আনন্দদায়ক স্বপ্ন দেখানো হয় তাতে শয়তানের হিংসা হয় এবং তাড়াতাড়ি স্বপ্নদ্রষ্টাকে জাগিয়ে দেয় ও স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নাবেশ মু’মিনের আপসোস এসে যায় যে, পরিতাপের বিষয়! একটা ভাল স্বপ্ন দেখছিলাম, এত তড়িৎ জেগে গেলাম এবং অনেক সময় শয়তান (ক্ষেত্র বিশেষে) অনুপ্রবেশ করেও

মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশ্রিত করে দেয়। আলমগণ বলেন, দশ প্রকারের স্বপ্ন ফেরেশতাদের সাথে নির্দিষ্ট, যেগুলোতে শয়তানের অনুপ্রবেশ নাই। (১) ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ (২) নবীগণের সাক্ষাৎ (৩) কোরআন শরিফ দেখা (৪) আসমান দেখা (৫) মেঘমালা দেখা (৬) বৃষ্টি বর্ষণ দেখা (৭) তারকারাজি দেখা (৮) সূর্য দেখা (৯) চন্দ্র দেখা (১০) আউলিয়াগণকে দেখা।

ফায়দা/উপকারিতা: “জাওয়াহেরে খাম্ছা” নামক গ্রন্থে হযরত গাউস গাওয়ালিয়ারি (রহ.) লিখেছেন, এ কথা স্পষ্ট যে, সির্রে ইনসানি বা মানুষের রহস্য ভাঙ দুই অংশে বিভক্ত। শেষাংশ অর্থাৎ নিচেরাংশ আলোহীন জুলমতের আকর। আর প্রথমাংশ অর্থাৎ উপরাংশ (মাথার দিকের) নূর ও আকলের ধনাগার। উক্ত অংশের মাঝখানে এক হৃদে ফা’ছেলা বা পরখকারী সীমা রয়েছে। আর নিন্দা শুরু হওয়ার কালে যখন ঐ সীমানা ফাঁকে “আবরে রফিক” বা বৃষ্টিবৎ কল্যাণ অবরুদ্ধ হয়, তখন আলস্যতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতা আরম্ভ হয়। এমনকি চোখের উপর এ আলস্যতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইন্দ্রিয় শক্তি কর্মহীন অকেজো হয়ে দেবদারুভ্রুম দীল পর্যন্ত পৌঁছে এবং মানুষকে বেহুশ করে দেয়। এটাই হচ্ছে ঘুম। এই সময় “আলমে মেসাল” বা দৃষ্টান্ত জগতের দরজাগুলো খুলে যায়। “তাজকিয়াতুল কুলুব” কিতাবে (বর্ণিত) আছে যে, “আলমে মেসাল” (দৃষ্টান্ত জগৎ) এমন এক জগৎ, রাব্বুল আলামিন এই “আলমে দুনিয়া” সৃষ্টি করার পূর্বেই এই “আলমে মেসাল” কে সৃষ্টি করেছেন। ঐ জগতের উপাদান দিয়ে এ জগতের সৃষ্টি করেন নি। কিয়ামতের মাঠে যেমন মানুষ পাপ পুণ্য স্বচক্ষে দেখবে তেমনি ঐ জগৎও সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। ঐ জগতের অস্তিত্ব সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বিধায় ঐ জগতের অস্বীকারকারী গুণাহগার হবে। কেনো বস্তুকে না দেখা তার অস্তিত্বকে অস্বীকারের কারণ হতে পারে না। যেমন “আনকা” (কাল্পনিক অমর পাখি) পাখির নাম প্রসিদ্ধ কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত দেখেনি।

এ দুনিয়ায় মানুষ যে আকৃতি-অবয়বে দেখা যায় এটা তার প্রকৃত আকৃতি নয়। ঐ আকৃতিও প্রকৃত আকৃতি নয় যা এ আলমে মেসালে প্রতীয়মান হয় এবং ওখানকার আকৃতি আপন আপন আমল বা কর্মের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। যেমন এখনকার জেনাকারীর আকৃতি ঐ জগতে কুকুরের আকৃতির মত হবে। পাপিষ্ঠদের কিয়ামতের দিন নিজ নিজ আমল বা কর্মের আকৃতির উপর যখন দৃষ্টিপাত হবে তখন অত্যন্ত আফসোস হবে। কিন্তু দুঃখ ও মনোবেদনা করা ছাড়া তাতে আর কোনো লাভ হবে না। মুমিনগণের উচিত যেন তারা আল্লাহ ও রাসূল (দ.)’র হুকুমানুযায়ী নিজ নিজ আমল পরিশুদ্ধ করে নেয়। যাতে করে “আলমে মেসালে” উত্তম মানব আকৃতিতে থাকে। যেমনটি এ দুনিয়ায় আছে। নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে এ সকল কথার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যাদের জানার অতি আগ্রহ আছে তা তারা নিরীক্ষণ করবেন। ঈমানের নূরে যে সকল লোকের দীল আলোকিত হয়ে গিয়েছে তাদের

দৃষ্টি শক্তি উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। এ দুনিয়ায় তাঁরা “আলমে মেসাল” কে দেখেন। আমাদের ভাইগণদের মধ্যে অধিকাংশকে এ গুণে গুণাবিত পাওয়া যায়।

কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য স্বপ্ন রহস্য গোপন থাকে না। যেমন : খোদা অন্বেষণকারীদের, যারা সত্য পীরে কামেল, মুর্শিদে মুকাম্মেল, যারা ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহর স্তর অতিক্রম করে মকামে মুশাহেদায় উপনীত হন। রাসূল ও নবীগণের স্থলাভিষিক্ত; বরং রাসূলে হাকিকী। “আশ্-শাইখু ফি কাউমিহি কান্ নাবীযী ফি উম্মাতিহি” –পীর নিজ জাতির মধ্যে–

“শায়খ বা পীর নিজ জাতির মধ্যে সেরূপ, যেরূপ উম্মতের মধ্যে নবী।” এ হাদিস শরিফের বিশুদ্ধতার উপর “আহলে বেলায়ত” ও “আহলে ইরফান” গণ ইজমা ও ইত্তেফাক হয়ে গেছেন। উল্লেখিত হাদিস শরিফে “কাফে তাসরিয়া” বা সাদৃশ্য জ্ঞাপক কাফ যেন এক মুখবন্ধনী ও অবগুষ্ঠন যদ্বারা “চেহুরায়ে মুখসুদ” বা অভিষ্টের মুখবয়বকে আবৃত করা হয়েছে। যেমন: “আল্লাহ নুরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ মাছালু নুরীহি” (আল্লাহ আসমান সমূহ ও জমিন সমূহের নূর, তাঁর নূরের উদাহরণ... আয়াতের শেষ তক) আয়াত শরিফে অধিকাংশ মুফাচ্ছেরিনের নিকট নূর শব্দদ্বয়ের দ্বিতীয় নূর শব্দটির মোরাদ বা উদ্দেশ্য রাসূল (দ.)’র জাতে পাক বা সত্তা এবং এটা ছয় তানাজ্জুলের (অবতরণীকা) মধ্যে প্রথম তানাজ্জুলের দিকে ইঙ্গিতবহ। কেন না যে মাহবুব (প্রেমাস্পদ) মাহবুবীয়তের (প্রেমাস্পদত্বের) সুউচ্চ স্তরে ও মাযাহেরে হোসনের (রূপের বিকাশ স্থল) ফরদে আক্মল (পূর্ণ একক সত্তা) হিসেবে নির্ধারিত হবে, তো অবশ্যই তাঁর মনমোহিনী রূপ ও মনোজ্ঞতা অন্যান্য মাহবুবগণের রূপ হতে অনেক বড় হবে এবং তাঁর ‘জাত’ বা সত্তা সম্মানের আবেষ্টনী ও মহত্ত্বের পর্দার ভিতর গুপ্ত হবে। বরং তাঁর নিজ অপরিমেয় “হোস্ন-জামাল” (শোভা-সৌন্দর্য) নিজের সত্তার আবেষ্টনী ও পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সূর্যের মত, সূর্য যেমন নিজেই নিজ তীক্ষ্ণ তেজস্ক্রিয়তা ও তীক্ষ্ণ রশ্মির দরুন নিজের অস্তিত্বের আবেষ্টনী ও পর্দা। এজন্যই হযরত সৈয়দ আবদুচ্ছালাম বিন বশীশ (ক.) নিজের মুনাজাতে বলতেন “আল্লাহমা জায়লীল্ হেজাবিল আজ’ মে হয়াতু রুহী” অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ‘হেজাবে আজম’কে আমার আত্মার হয়াত করে দাও। হেজাবে আজম বলতে এখানে নবী পাক (দ.)’র জাত বা সত্তাকেই বুঝায়। যেমন তাঁর [সৈয়দ আবদুচ্ছালাম বিন বশীশ (ক.)] পূর্বোক্ত “ওয়া হেজাবাকাল আজ’মুল কায়েম লাকা বায়না ইয়াদায়কা- অর্থাৎ এবং ঐ হেজাবে আজম যা আপনার জন্য আপনারই সামনে দণ্ডায়মান।” বাণীতে ইহাই ইঙ্গিত বহন করে। এই কারণে সুফিয়ানা আলমগণ রাসূলে পাক ছাহেবে লাউলাক্ (দ.)’র জাত বা সত্তাকে বরযখে কোবরা বলে থাকেন ও মুর্শিদে কামেলের অবয়বের ধ্যানকে “শুগলে বরযখ” বা বরযখ ধারণ বলে থাকেন। (চলবে)

ফিকহ্ শাস্ত্রঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সৈয়দ আবু আহমদ

ফিকহ্ সম্পর্কে পবিত্র আল কোরআনের বিশটি স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন; “তবে (যুদ্ধের সময়) বিশ্বাসীদের সকলের এক সাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি অংশ অবশ্যই যুদ্ধ যাত্রায় বিরত থেকে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মবিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। এ জ্ঞানীরাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যোদ্ধাদের নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতন করে তুলবে। ফলে তারা অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে”- (সূরা তওবা : ১২২)।

উপর্যুক্ত আয়াতে (১) ধর্ম বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত, (২) নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতনতা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। এখানে নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনকে সমদৃষ্টিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ সূরা তওবার ১২২নং আয়াতের সারমর্মে ফিকহ্ সম্পর্কে কোরআনিক ধারণা পাওয়া যায়।

হাদীসে ফিকহ্ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়েছে;

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ফিকহ্ (ইউফাক্কিহ্ ফিদ-দ্বীন) দান করেন”-(বুখারী ও মুসলিম)।

তিরমিযি শরিফে উল্লেখ আছে, “শয়তানের জন্য একজন ফিকহ্ হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা ভয়ংকর”।

অতএব, আভিধানিক অর্থে ‘ফিকহ্’ বলতে যে কোন বিষয়ের গভীর জ্ঞানকে বোঝালেও কোরআন ও হাদীস দ্বারা ‘ফিকহ্’ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ জীবন বিধান সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় ‘ফিকহ্’ বলতে তাই ইসলামী জ্ঞানের বিশেষ কোন শাখাকে বোঝানো হতো না বরং সামগ্রিক ভাবে গোটা দ্বীন সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে বোঝানো হতো।

তাই ইসলামী পরিভাষায় ‘ফিকহ্’ হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখা যা শরীয়াহ’র প্রামাণ্য উৎস থেকে শরীয়াহ’র শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি বিধান আহরণ বা ইস্তিহাত করে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ফিকহ্ সম্পর্কে বলেন- “শরীয়াহ’র বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে ব্যবহারিক শরীয়াহ’র বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ্ বলা হয়। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্লাহ)

সংক্ষেপে বলা যায়- ‘ফিকহ্’ হচ্ছে ইসলামী আইন কানুন এবং এ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারাবাহিক, সুশৃঙ্খল সিদ্ধান্ত মূলক

আলোচনা-পর্যালোচনা।

ইলমুল ফিকহ্ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে- দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- “ফিকহ্ হচ্ছে নফস এর পরিচয় লাভ করা তথা কি কি নফসের অনুকূল (কল্যাণকর) এবং কি কি প্রতিকূল (ক্ষতিকর) সে সম্পর্কিত জ্ঞান”।

ইলমুল ফিকহ্ এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে; ক. ইবাদাত : যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের নিয়ম কানুন বলে দেয়।

যেমন- সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। খ. মু’আমালাত : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান। যেমন- কেনাবেচা

(বাঈ), ঋণ, ভাড়া, আমানত, জামানত ইত্যাদি। গ. মানাকিহাত : মানববংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেমন-

বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। ঘ. উকুবাত : বিভিন্ন অপরাধ। যেমন- চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি। ঙ. মুখাসামাত : আদালতি বিষয়।

যেমন- অভিযোগ, বিচারবিধি, সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি। চ. হুকুমাত ও খিলাফত : শাসক নির্বাচন, বিদ্রোহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জিহাদ, সন্ধি, চুক্তি, কর আরোপ ইত্যাদি।

‘ফিকহ্’ এর উৎপত্তি :
‘ফিকহ্’ এর মূল উৎস হচ্ছে মানুষের প্রতি শরীয়ত সম্পর্কে আল্লাহুতায়ালার আদেশ নিষেধ সম্বলিত বাণী। তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, নবুয়ত প্রকাশের পর রাসূলুল্লাহ (দ.) এর মক্কী জীবন থেকেই ফিকহ্ এর যাত্রা শুরু। কিন্তু বস্তুতঃ মক্কী জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নাযিল হলেও তার খুব সামান্য অংশই ছিল বিধি বিধান সম্বলিত এবং প্রায় সবটুকুই ছিল দ্বীনের মৌলিক বিষয় বা আক্বিদা অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম এবং দ্বীনের প্রচার সংগণাবলীর বিকাশ, সামাজিক কু-প্রথাগুলোর নিন্দা ইত্যাদি। আহকাম সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত আয়াতই প্রিয়নবী (দ.)-এর মদীনায় হিজরত করার পর থেকে নাযিল হতে থাকে এবং মাদানী জীবনের দশ বছর ব্যাপী তা চলতে থাকে।

অতএব, আমাদের জন্য এটা বলাই অধিকতর যথার্থ হবে যে, ফিকহের শুরু বা উৎপত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর মাদানী জীবনের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রথম হিজরী সন হতে।

ফিকহ্‌র উৎস প্রকৃত অর্থে বিশ্বনবী (দ.)'র মদিনা জীবনে শুরু হয়।

(ক) ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর যুদ্ধ বন্দিদের বিষয়ে ফয়সালার জন্যে সাহাবা কেরামের সঙ্গে মতিবিনিময় করেন নবীজী (দ.)। বিভিন্ন পরামর্শের মধ্যে দুটি প্রস্তাব আলোচনায় আসে। (১) হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) সহ বেশির ভাগ সাহাবা কেরাম ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ বন্দিদের ক্ষমার বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব দেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণিমত এবং বন্দি বিনিময় হিসেবে অর্থ আদায় সম্পর্কে কোন প্রস্তাব না রাখলেও বেশিরভাগ সাহাবা অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তিদানের পক্ষে মতামত পেশ করেন। (২) অন্যদিকে হযরত ফারুককে আজম (রা.) প্রত্যেক যুদ্ধ বন্দীকে স্ব স্ব গোত্রের আত্মীয় (যারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন এবং সাহাবা মর্যাদা প্রাপ্ত) কর্তৃক হত্যা করে শত্রু বিনাশের প্রস্তাব দেন। বিশ্বনবী (দ.) হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)'র প্রস্তাব অনুমোদন করে তা কার্যকর করেন। অবশ্য এর পরে হযরত ফারুককে আজমের (রা.) প্রস্তাবের পক্ষে ওহী নাযিল হয়, যাতে অর্থের বিনিময়ে বন্দি মুক্তি দানের বিষয়টি নাকচ করা হয় এবং কঠিন আযাবের বিষয়ে হুশিয়ারি প্রদান করা হয়।

(খ) খন্দকের যুদ্ধ বিষয়ে দৌলতুন মদিনা'র প্রতিরক্ষা বৃহৎ গড়ার লক্ষ্যে, চতুর্দিকে পরিখা খননের জন্যে পারস্য রণকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)'র মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর হয়।

(গ) মক্কা বিজয়কালে মক্কার প্রান্তে দশ সহস্রাধিক সেনাবাহিনী সমেত তাঁবুতে অবস্থানরত বিশ্বনবী (দ.) সমীপে হযরত আব্বাস (রা.) উপস্থিত হয়ে মক্কার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক মতবিনিময় করেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবা কেরামসহ আলোচনার পর বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে কিছু শর্তারোপ করা হয়। এ সকল শর্তের মধ্যে মুখ্যটি ছিল মক্কার প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করবে, কেউ সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় অবস্থান করতে পারবে না। এ শর্ত পালনকারীদের জীবন ও সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। ইতোমধ্যে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র হস্তে নিজেকে সমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোতালিব (রা.)'র প্রস্তাবক্রমে আবু সুফিয়ানের গৃহে অবস্থান গ্রহণকারীদেরকেও নিরাপদ বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

এছাড়া প্রতিটি জিহাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিশ্বনবী (দ.) সাহাবা কেরামের সঙ্গে মতবিনিময় ও

পরামর্শ পর্বে অংশগ্রহণ করতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বনবী (দ.)'র এ ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া ফিকহ্‌র উৎস হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

‘ফিকহ্‌’ এর বিকাশ :

উৎপত্তিকাল থেকে শুরু করে ‘ফিকহ্‌’ এর ক্রমবিকাশকে প্রধান তিনটি পর্যায় বা যুগে ভাগ করা যায়।

১. রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর যুগ :

“নিঃসন্দেহে মুমিনদের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ তথা ইহসান এ যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র আয়াত (বিধি বিধান) তাদের পাঠ করে শোনান, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদের কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল”- (সূরা আলে ইমরান : ১৬৪)।

উপর্যুক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে অন্তর পরিশুদ্ধির মাধ্যমে কিতাব ও হিকমা শিক্ষার বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাসাওউফ সাধনার মাধ্যমে অন্তরকে সংযত এবং সুনিয়ন্ত্রিত রেখে কিতাব ও হিকমা শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় কিতাব ও হিকমার জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে তাসাওউফের সত্যনিষ্ঠ আলোকে জীবন গঠন।

প্রথম যুগের সময়কাল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মদীনায হিজরত তথা ১ম হিজরী হতে পর্দা করা পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ম হিজরী পর্যন্ত। এ যুগে ফিকহের যাবতীয় বিষয়ই সরাসরি প্রিয়নবী (দ.)'র পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। রাসূল (দ.)'র কাছে নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ ওহী আল-কোরআন আর পরোক্ষ ওহী যা হাদীস রূপে আমাদের কাছে এসেছে এর ভিত্তিতে ফিকহ্‌র সূত্রপাত। যেকোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন, উদ্ধৃত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফতওয়া, ফারাইয, দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কুরআনের হুকুম আহকামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই ওহীর আলোকে তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন, সাহাবাদের (রা.) তা শিক্ষা দিতেন এবং বাস্তবে সমাজে প্রয়োগ করে দেখাতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকহ্‌ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

তথাপি, পরবর্তী যুগের ফিকহ্‌ শাস্ত্রের সব মৌলিক বিষয়ের গোড়াপত্তন এ যুগেই হয়েছিল। এমনকি, ফিকহ্‌ এর গতিশীলতার প্রধান উপকরণ যে ‘ইজতিহাদ’ ও ‘কিয়াস’ এর শিক্ষাও এ যুগেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিদ্যমান আছে।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) মুআয ইবনে জাবাল (রা.) কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআয

তুমি কীসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব (আল কোরআন) দিয়ে, হুজুর (দ.) বললেন, যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে তা না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সুন্যাহ্ দিয়ে, রাসূল (দ.) বলেন, যদি তাতে না থাকে? তিনি বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করে রায় দিবো। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) বললেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সন্তুষ্ট”-(আহমদ)।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর যুগে যেসব সাহাবী (রা.) ফতওয়া প্রদানে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) হযরত ইমাম আলী (রা.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত যায়িদ বিন ছাবেত (রা.) অন্যতম।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর যুগ তথা ‘ফিকহ্’ এর উৎপত্তি যুগের কর্মপন্থার পর শুরু হয় ফিকহ্‌র দ্বিতীয় অধ্যায়।

২. সাহাবা (রা.) গণের যুগ:

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর বেসালের পরবর্তী সময় অর্থাৎ দশম হিজরী থেকে ফিকহ্‌র সাহাবা যুগের সূত্রপাত। এর ব্যাপ্তি ৯০ বা ১০০ হিজরী পর্যন্ত ধরা যায়।

এ সময় হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)’র খলিফা নির্বাচন, হযরত ফারুকে আযম (র.)’র খলিফা মনোনয়ন, হযরত উসমান গণি (রা.)’র খলিফা নির্বাচন, রিদ্কার যুদ্ধ, সিরিয়া-পারস্য বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফিকহ্‌র বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

‘ইজমা আস সাহাবা’ নামক শরীয়াহ্ তৃতীয় মূল উৎস রূপলাভ করা ছাড়াও এ যুগে বিশাল খিলাফতের অধীন আরব অনারব এলাকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের পার্থক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা সমস্যা সমাধানে কোরআন-সুন্যাহ্ হতে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর বিধান আহরণের ফলে প্রথম দুটি উৎস (কোরআন ও সুন্যাহ্) হতে বিধান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান আরো বিকশিত হয় এবং পরবর্তী যুগের ফিকহ্‌র জন্য এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা তৈরী হয়।

৩. সাহাবা যুগের পরে তাবঈনদের যুগ আরম্ভ হয়

এ সময় যেসব বিষয়ের সমাধান সরাসরি কোরআন-সুন্যাহ্‌তে পাওয়া যেতনা এবং যার সমাধান সাহাবাদের সম্মিলিত কোন সিদ্ধান্তও ছিলনা, এরূপ অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবা (রা.) গণ কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এ যুগে

কিয়াসের ব্যবহার আরো ব্যাপকতা লাভ করে।

খোলাফায়ে রাশেদুন পরবর্তী তাবঈ যুগে শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের মাধ্যমে রাসূল (দ.) এর যুগ ও সাহাবা (রা.) যুগের ‘ফিকহ্’ সম্পর্কিত জ্ঞান যথাযোগ্যভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে পরবর্তী যুগের নিকট পৌঁছে এবং ফিকহ্‌র পরবর্তী যুগ তথা চূড়ান্ত বিকাশপর্বের সূচনা হয়।

৪. তাবঈ-তাবঈন যুগ:

এ যুগকে ফিকহ্‌র চতুর্থ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের যুগও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (দ.) উল্লেখ করেছেন;

“সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তারপর এর পরবর্তী যুগ এবং তারপর এর পরবর্তী যুগ”।

ফিকহ্‌র ইতিহাসে এই যুগ সর্বাধিক গৌরব উজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে ফিকহ্‌র আকাশে এমন কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে যারা পূর্ববর্তী তিন যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে ব্যবহার করে নিজেদের সুউচ্চ প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে ‘ইলমুল ফিকহ্’ কে ইসলামী জ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখায় রূপদান করেন এবং এ শাস্ত্রের মূলনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

এ যুগের ব্যাপ্তি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের প্রথমার্ধে আবির্ভাব ঘটে হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফেঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)’র মত ফিকহ্‌র শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের।

তদুপরি, এ যুগের দ্বিতীয়ার্ধে আরো একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় আর তা হল হাদীস বিজ্ঞান। এ সময় ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.)’র মতো শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের আবির্ভাব হয়। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় নীতি তথা উসুলুল হাদীস প্রণীত হয়। এ সবেল ভিত্তিতে সিহাহ্ সিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়।

চতুর্থ যুগের ফিকহ্‌র বিকাশকে এ যুগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তথা প্রসিদ্ধ ইমামদের অবদান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা দরকার, কেননা এ যুগের ফিকহ্‌র সামগ্রিক অগ্রগতি তাদেরকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। সময়ানুক্রমিকভাবে আগত ইমাম গণের ফিকহী চিন্তাধারা ও অবদানের বিশ্লেষণ করলেই এ যুগে ফিকহ্‌র বিকাশ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রমাণ হবে ফিকহ্ একটি চলমান শাস্ত্র। (চলবে)

হে অতীত কথা কও

[আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া। বেসুমার দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী (দ.)'র প্রতি। সালাম গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.) সহ সকল আউলিয়া কিরামের প্রতি।

আমাদের সহৃদয় পাঠক সমীপে শুভ বার্তা হচ্ছে আলোকধারা ইতোমধ্যে সিকি শতাব্দী অতিক্রম করে ২৮তম বর্ষে পদার্পন করেছে। সময়টি খুব একটা কম নয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক প্রথিতযশা লেখকের কলমের কালির আঁচরে আলোকধারা অর্জন করেছে অনেক সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি। প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত লেখকদের অনেকই আল্লাহর অপার ইচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তারা এখন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু স্মৃতির আড়ালে নয়। তাঁদের অবস্থান আমাদের অন্তরালে জাগরুক আছে। তাঁদেরকে নিয়েই আমাদের অতীত। তাঁরাই আলোকধারার ঐতিহ্য এবং চিন্তা চেতনার নির্মাতা। আমরা তাঁদেরকে স্মরণ রাখতে চাই। তাদের স্মরণ করার মধ্যেই রয়েছে আলোকধারার আত্মিক জাগৃতি। তাঁদের লিখা সমূহ পুনঃমুদ্রণের মাধ্যমে তাঁদেরকে আমরা চর্চায় রাখতে চাই। আমরা তাঁদেরকে ভুলব কি করে? তাঁরাই একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আর্থিক কৃচ্ছতার মধ্যেও পর্যাপ্ত আন্তরিকতা নিয়ে আলোকধারা প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁরা আলোকধারার স্মৃতিতে অম্লান। আলোকধারা কর্তৃপক্ষ তৎসময়ে ছাপানো তাঁদের লিখাসমূহ পুনঃমুদ্রণ করে সমৃদ্ধ অতীতকে পাঠক সমীপে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। স্মৃতিতে যঁারা অম্লান তাঁদের মধ্য হতে এ সংখ্যায় খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ব্যারিস্টার আলহাজ্ব বজলুস ছত্তার, কবি সুলেখক শওকত হাফিজ খান রশ্মি এবং সম্প্রতি পরলোকগত সৈয়দ আমিরুল ইসলাম মাইজভাগুরী'র (বিসিএস) সংক্ষিপ্ত পরিচিত সহ তিনটি লিখা বর্তমান সময়ের পাঠকদের চর্চার সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।] – সম্পাদক

বিশ্ব মানবতাবাদ বনাম ইসলাম

আলহাজ্ব বজলুস ছত্তার

(ব্যারিস্টার বজলুস ছত্তার হলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা নিবাসী ছত্তার পরিবারের খান বাহাদুর আবদুস ছত্তারের পুত্র। ইউরোপে শিক্ষা সম্পন্নের পর জ্ঞান তালাশের এক পর্যায়ে তিনি মিশরের হাজার বছরের পুরানো জগৎ বিখ্যাত আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। দেশে ফিরে পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে নিজস্ব কাজ-কারবারের পাশাপাশি সমাজসেবা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। খন্দর কাপড় পরিধানে অভ্যস্ত জনাব বজলুস ছত্তার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে পাঠাগারে মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী'র তোহফাতুল আখইয়ার এবং আত তাওজিহাতুল বাহিয়ায় গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মাইজভাগুর দরবার শরিফ সম্পর্কে জ্ঞাত হন। কর্ম জীবনের ভিন্ন বাঁকে তিনি গাউসিয়া হক মনজিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং দরবার ভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (ক.)'র দয়া প্রাপ্তির সুযোগ লাভে ধন্য হন। তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই। আলোকধারার প্রাথমিক সময়ে ১০ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৪ইং তারিখে প্রকাশিত তাঁর একটি লিখা শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে এ সংখ্যায় পত্রস্থ করা হলো।)

জিলহজ্জ মাসের ১ তারিখ হতে ৯ তারিখের মধ্যে মক্কা

মোয়াজ্জামায় সেলাই বিহীন দুটুকরা সাদা কাপড় আরবী ভাষায় 'এহরাম' পরিহিত অবস্থায় খালি মাথায়; সব রকম সাজ-সজ্জা বর্জিত, তথা অহংবর্জিত-অহংকার বর্জিত অবস্থায় আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা "আল-কোরআনের ভাষায় 'পৃথিবীর প্রথম গৃহ' চতুরে উপস্থিত হয়ে সাতবার তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার পর সাফা-মারওয়া নামে দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌড় বা দ্রুত গতিতে সাতবার যাতায়াত করা ও তারপর জিলহজ্জ ৯ তারিখে আরাফাত ময়দানে সকাল হতে আসর পর্যন্ত খোলা ময়দানে অবস্থান, নামায আদায়, "খোত্বা" বা বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনার" পর সন্ধ্যায় মোজদালেফায় খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন, পরের দিন মিনায় উপস্থিত হয়ে মোজদালেফায় সংগৃহীত ২৭টা পাথরের ৯টা প্রতিষ্ঠিত ছোট মাঝারি বড় শয়তানকে মারা ও কোরবানী দেওয়া; ১২ই জিলহজ্জে শেষ তাওয়াফ করার মাধ্যমে হজ সমাপ্ত করা হয়। প্রায় পনের হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক কাবাগৃহ নির্মাণ করার পর হতে হজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আল-কোরআনে আল্লাহতালা বলেছেন, "আজ্জানা ফিল্লাছে বিল হজে"-সমস্ত মানবজাতিকে হজে শরীক হওয়ার জন্যে আহ্বান কর-হযরত ইব্রাহীম কর্তৃক এই আহ্বান প্রচারিত হওয়ার পর হতে হজ শুরু হয়। খৃ. সপ্তম শতাব্দীতে মক্কা বিজয়ের পর নগ্ন দেহে ও অপবিত্র অবস্থায় মদ্যপানের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাবাগৃহের চতুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু কোন সময়েই আল্লাহতালা চিরন্তন নির্দেশ-"আল-কোরআনে বিদ্বৃত "লিল্লাহে আলাল্লাছে হজ্জুল বায়তে" অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রত্যেক মানুষ যার শারীরিক আর্থিক সংগতি আছে, সে জীবনে অন্তত একবার এই

বিশ্বমানবের মিলন কেন্দ্রে বৎসরের নির্দিষ্ট ৯, ১০, ১১, ১২ জিলহজে উপস্থিত হয়ে হজের অনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে বিশ্বমানবের ঐক্য সখ্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় শরীক হবে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত ফরাসী পর্যটক ডাউটিরেজ এর লিখায় আরব ভূখণ্ডে ব্যাপক সফর ও হজের বিবরণ পাওয়া যায়। শিখ সম্প্রদায়ের প্রাণ পুরুষ গুরু নানক দুইবার হজ করেছেন বলে শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেবে উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্ম ধর্মনেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা, রাজা রাম মোহন রায় হজের উদ্দেশ্যে বা হজের সময়ে মক্কা শরিফে উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁর লিখিত ধর্মীয় পুস্তকে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল-কোরআনের সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদকারী ভাই গিরিশচন্দ্রের অনূদিত আল-কোরআনের সূরা হজের বিশ্লেষণে তাঁর হজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

১৯৩২ সনের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট সউদী পরিবার দ্বারা মক্কা ও মদিনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৪ সনে এংলো-আরবীয়ান কোম্পানী কর্তৃক সউদী আরবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তৈলক্ষেত্র হতে তেল উত্তোলন আরম্ভ করার পর হতে পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয়। ১৯৩৯ সনে অনারব হাজীদের উপর ৬০/- ষাট টাকা ট্যাক্স ধার্য করা হয়। ঐ ট্যাক্স ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ৪০০০/- টাকায় দাঁড়িয়েছে। (উপর্যুক্ত তথ্য ১৯৯৪ সালের)

পূর্বোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আল-কোরআনে বর্ণিত “ফা আন্বান্নাছে উম্মতান ওয়া হেদাতান”- সমগ্র মানবজাতি এক পরিবার এবং বিশ্ব মানবের এক সময়ে এক জায়গায় মহামিলন ভাব-ভাষা অবস্থা-ব্যবস্থার বিষয়ে আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। অর্থনৈতিক সাম্য ন্যায় বিচার, শিষ্টাচার হজের সময়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ইত্যাদির স্থলে, নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে হজ সীমাবদ্ধ করে ইসলাম তথা দুনিয়ার সকল ধর্মের মূলমন্ত্র প্রেম-প্রীতি ভালবাসার স্থলে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা গোষ্ঠী স্বার্থে বিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রতি বৎসর হজ মৌসুমে উপার্জিত পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার সিংহভাগ, ভোগ-বিলাস ও অন্যান্য অকাম্য অপচয় ও অপব্যয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাতিসংঘের সদস্য মুসলিমদেশগুলির দ্বারা হজ নিয়ন্ত্রণের দাবী বহুকাল থেকে উঠেছে। অচিরে সব মুসলিম দেশের জনগণকে এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

পুণ্যাত্মা জিয়া বাবা সৈয়দ আমিরুল ইসলাম

(প্রকাশের প্রাথমিক সময় থেকে সৈয়দ আমিরুল ইসলাম মাসিক আলোকধারা’র সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্তদের একজন। তিনি আলোকধারায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর লিখার ধারাতে ছিল কাব্যিকতা। স্বীয় মুর্শিদের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য এবং

প্রেম নিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রতিবেদন ও ভাবাবেগে ভরপুর তাঁর লিখাসমূহ মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের অনবদ্য দলিল। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অনন্য তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র বেলায়তী ক্ষমতা এবং কর্মচেতনার আলোকে লিখিত তাঁর বই সমূহ হচ্ছে। (১) নিত্যবাজে হিয়ার মাঝে, (২), BEYOND THE PERIPHERY, (৩) SHAHANSHA ZIAUL HUQ MAIZBHANDARI প্রভৃতি। জনাব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদে দায়িত্ব পালনের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সৈয়দ আমিরুল ইসলামের জন্ম চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ গ্রামে। ঢাকায় তিনি উত্তর খান দরগাহ পাড়াস্থ বাসভবন ‘নজর-ই-জিয়া’য় থাকতেন। মাইজভাণ্ডারী মরমী চেতনার ধারক হিসেবে তিনি স্বীয় বাসভবনের নাম রাখেন ‘নজর-ই-জিয়া’। বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রকাশার্থে আলোকধারা ‘হে অতীত কথ কও’ কলামে ‘শাহানশাহ জিয়া’ স্মরণে লিখিত একটি কবিতা প্রকাশ করা হলো।

পুণ্যাত্মা জিয়া বাবা

তোমার পুণ্য জন্মতিথি আসে যখন বছর ঘুরে
জেগে ওঠে সজল ধারা কি অভিনব গানের সুরে।
কর্ণফুলী হালদা নদী কীর্তিনাশার ভাংগনকুল
দিনরজনী ফোটায় শুধু জিয়া নামের পদ্ম ফুল।

তেতুলিয়ার প্রান্ত হতে কুয়াকাটার সাগরতট
চারিধারে উজল শোভে তোমার নামের দৃশ্যপট।
লক্ষ হাজার পত্র শাখে দেখি তোমার আসন পাতা
চিত্ত লোকে ভাবনা জাগে প্রভু আমার মহান দাতা।
কখন করে রহম করে ক’জনে তা রাখে খবর
দীন ভিখারী রাজা বনে যে পেয়েছে তোমার “নজর”।

কত মণি লুকিয়ে আছে তোমার পূত কদমতলে
মনের সাথে কুড়িয়ে নেয় যে সন্ধানীরা দলে দলে।
এমনিতর শত কোটি লক্ষ বছর গড়িয়ে যাবে
পথহারা নিঃস্বজনে তোমার প্রাণের খবর পাবে।

পুণ্যতিথির আবির্ভাবে প্রতি বছর নতুন সাজে
বিপুল বিশাল মহীরুহ দেখা যাবে তোমার মাঝে।
নিত্য নব কুসুমরাশি ফুটবে তোমার পুণ্য ধামে
গঞ্জে গ্রামে বসবে মেলা তোমার মহান পূত নামে।

আসা-যাওয়ার এই মেলাতে রইবে তুমি অব্যয়
তোমার নামের সোনার খনি রইবে চির অক্ষয়।

(১ম প্রকাশ আলোকধারা ১০ পৌষ ১৪০২)

শিশুতোষ

অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ : শিশুর মনের কথা বুঝুন

আরেফিন রিয়াদ

আজকালকার শিশুরা নীল আকাশ এবং সবুজ ঘাসের স্পর্শ পায় না। মনে হয়না অবাক করে দিয়ে চাঁদের বুড়ি কিংবা রূপকথার গল্প শোনায় কেউ। আর বসেনা চাঁদনী রাতে উঠানে বসে পুঁথি পাঠের আসর। কার্টুনের বেড়াজালে আটকে দিয়েছে রহস্যময় নানা গল্প, হাতে হাতে নানা রকমের আধুনিক ডিভাইস কিংবা ভিডিও গেমস। যার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে গল্প বলার সংস্কৃতি। আমাদের শহুরে সভ্যতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। এখানে নেই শিশুর জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ বা শিশু বিনোদন কেন্দ্র। বাবা মায়ের কর্মব্যস্ততার ফলেও হয়ত শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হচ্ছে না। তবে শিশুর শৈশবকালীন বিকাশ যেন সঠিকভাবে হয় তার দায়িত্ব পরিবারকেই নিতে হবে।

অনেকেই মনে করেন, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই কড়া শাসনে রাখলে হয়ত সে সব কিছু শিখবে। আবার কোনো বাবা-মার মতে, সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে এবং জানতে হবে তার সব অনুভূতির কথা।

সন্তান যদি আপনাকে ভয় পায়, তাহলে ছোট থেকে সে আপনাকে কখনও নিজের মনের কথা সাহস করে বলতে পারবে না। এজন্য সন্তানের আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি জানা জরুরি। এ প্রসঙ্গে শিশুর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে কায়দাগুলো আমাদের রপ্ত থাকা দরকার।

>> আপনার ব্যস্ততার মধ্যেও সন্তানের জন্য কিছুটা সময় বের করুন। অনেক সন্তানই মনে করে, তাদের বাবা মা তাদের যথেষ্ট সময় দেন না। তখন ওরা নিজেদের বঞ্চিত ও অবহেলিত মনে করতে থাকে। তাই ছুটির দিনে তাদের নিয়ে বেড়াতে যান। বেড়ানোর ক্ষেত্রে এমন স্থান নির্বাচন করবেন যাতে সে আনন্দ পায়। চিড়িয়াখানা, শিশু পার্ক, জাদুঘর পছন্দের তালিকায় রাখা যায়।

>> অবসর সময়ে তাদের সাথে গল্প করুন। তার ইচ্ছেগুলো মনযোগ দিয়ে শুনুন। শিশুরা তাদের চাওয়া-পাওয়া, আবদার ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য বেস্টফ্রেন্ড চায়। আপনার মধ্যে যদি সন্তান সেই ভরসার জায়গাটা খুঁজে পায়, তাহলে সে আপনাকেই বেস্টফ্রেন্ড ভাবে। সারাদিনের শেষে সন্তানের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কিছুটা সময় কথা বলুন।

>> সে যে কাজ করতে ভালোবাসে তাকে তাই করতে দিন। সন্তানের পছন্দকে প্রাধান্য দিন। কখনো তার পছন্দের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করবেন না। শিশু যে রং পছন্দ করে, তাকে সে রঙের পোশাক বা খেলনা কিনে দিন। কী পোশাক পড়বে বা কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে, সেই বিষয়ে ওকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

>> লেখাপড়ার বিষয়ে জোর না করে বরং তাকে আগ্রহী করে তুলুন। বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক গল্পের বই পড়তে দিতে পারেন।

>> শিশুকে বকা বা ভয় দেখাবেন না। এটি তাদের মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শিশুর সামনে ঝগড়া করবেন না। বাবা-মা ঝগড়া করলে সন্তানরা বিষণ্ণতায় ভোগে যা তাদের মধ্যে থেকে যায় পরবর্তীতে।

>> তাদের জীবনে কী ঘটছে, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। তবে যেন সে বুঝতে না পারে, আপনি তার উপর নজরদারি করছেন। কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক তা প্রথম থেকেই শিশুকে বন্ধুসুলভভাবে শেখান।

>> আপনার আচরণগুলো তার মানসিকতা তৈরিতে অনেকাংশে প্রভাব ফেলে। তাই শিশুর সামনে সুন্দর আচরণ করুন।

>> দীর্ঘ সময় ধরে গেমস খেলা বা কার্টুন দেখা থেকে বিরত রাখুন। কেননা এর ফলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত, স্থূলতা, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, অতি কল্পনাসহ নানান জটিলতা দেখা দিতে পারে। জাপানে শিশুদের উপর করা একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, যে সব শিশুরা নিয়মিত কার্টুন দেখে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণে বেশি। এই গবেষণা কাজে গবেষকগণ 'পোকেমন' কার্টুনকে বেছে নিয়েছেন যা বাংলাদেশেও সম্প্রচার করা হয়। এবং এটিকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ সহিংস কার্টুন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের কার্টুন দেখার ফলে শিশুদের সহিংসতাপূর্ণ মনোভাব তৈরি হতে পারে। তাই এ ধরনের কার্টুন দেখা হতে শিশুদের বিরত রাখুন।

>> মানবিক গুণাবলি রপ্ত করতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে জনহিতকর কাজে আগ্রহী করে তুলুন। প্রতিটি কাজের শেষে তা মূল্যায়ন করে তার প্রশংসা করুন এবং পুরস্কৃত করুন।

>> সময়ানুবর্তিতা, অধ্যবসায় এই বিষয়গুলোও শিশুকে ছোট বেলা হতেই শিক্ষা দিন।

শিশুর মধ্যে নেতিবাচক কোন বিষয় খেয়াল করলে তাকে বুঝিয়ে বলবেন সুন্দরভাবে, বকাঝকা করে নয়।

>> বাবা-মায়ের সাথে শিশুর একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করুন যেন সে নির্দিধায় মনের সব কথা খুলে বলতে পারে।

>> শিশুকে শারীরিক অনুশীলনে আগ্রহী করে তুলুন। প্রতিদিন খেলাধূলা ও দৌড়াদৌড়ি করতে দিন। এতে তার শরীর ও মন দুটোই সুস্থ থাকবে।

>> পরিবারকে বলা হয়ে থাকে প্রাথমিক পাঠশালা। শিশুর শৈশবকালীন বিকাশ ও তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবারের কোন বিকল্প নেই। তাই তাকে বুঝুন, তার কথা শুনুন এবং তাকে উপহার দিন আনন্দে মাখামাখি শৈশব।

>> শিশুর সামনে পরদোষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, খারাপ অভ্যাস গুলো আলোচনা করবেন না। এতে তারাও এমন খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

পাঠক মতামত

আলোকধারা বুকস-এর “ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকলন”

মোঃ মফিজ উদ্দিন

সকল সৃষ্টির সেরা, মহামহিম প্রভুর সর্বশেষ বাণী বাহক এবং বিশ্ব জাহানের রহমত, পরম করুণাময়ের সত্তা ও গুণাবলীর সর্বশেষ মূর্ত বিকাশ; হযরত মুহাম্মদ (দ.) এ ধরণীতে ১২ রবিউল আউয়াল পদার্পণ করেন। তাই রবিউল আউয়াল মাসে মহাবিশ্বে সকল আশেকে রাসূলগণের (দ.) হৃদয়ে প্রেমময় আনন্দ বিরাজমান থাকে এবং তারা অন্তরে অনাবিল শান্তির প্রত্যাশায় নিবেদন করে অগনিত দরুদ ও সালাম।

মহান জাতে পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সরকারে দো আলম (দ.) এর স্মরণে সৃষ্টির সূচনা থেকে আজও ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) চলমান রেখেছেন। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে নবী প্রেমিকগণ মহানবী (দ.) এর আগমন স্মরণে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপন করে থাকে। লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিকগণও এই কাজে পিছিয়ে নেই। তারাও তাদের রচনায় এই মহান দিবসের বিবরণ নানাভাবে উপস্থাপন করে নিজেদের মনের ভালবাসা প্রকাশ করে নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আখেরী নবী রহমাতুল্লিল আলামীন (দ.) এর জন্মবৃত্তান্ত, নাম মোবারকের বিশেষত্ব, মুজিয়া, সিফাত, সিরাত তথা তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন, মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর গুণকীর্তন, মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপনের শরঈ দলিল ও গুরুত্ব-তাৎপর্য-পদ্ধতি ইত্যাদি বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রিত মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা সংস্থা “আলোকধারা বুকস” কর্তৃক দেশবরণ্য, বিজ্ঞ লেখক, গবেষকদের অসাধারণ সহজ সরল সুন্দর সাবলিল ভাষায় “ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকলন” নামক ১২৮ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলনটির শুরুতে দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, গাউসিয়া হক মনযিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম) সেই মহান বাণীকে স্থান দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি সকল মত ও পথের অনুসারীদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন “ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপিত হোক মহাসমারোহে সকলের সম্মিলিত উদযোগে”। এতে আরো সংযোজন করা হয়েছে

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত আল্লামা মুফতি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) এবং খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, বাহরুল উলুম, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল গনী কাঞ্চনপুরী (র.) এর রচিত কালোত্তীর্ণ দুটি না’ত-ই রাসূল (দ.)। এরপর ধারাবাহিক ভাবে যে সব বিদ্বন্ধ লেখক, গবেষক, আলেমগণের প্রবন্ধ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে তাদের নাম ও প্রবন্ধ শিরোনামগুলো হলো- খুদে কলমে খুদে চিন্তা- মাওলানা সৈয়দ আবুল ফজল মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সুলতানপুরী; মদিনা সনদ এবং বহুত্ববাদী সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা- মোঃ মাহবুব উল আলম; একনজরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন- অধ্যাপক জহুর উল আলম; ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ; প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং তাঁর তাসাউফ জীবনের পুণ্যছায়ায় সাহাবীগণ - ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ; ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম; প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব তাৎপর্য- এস এম এম সেলিম উল্লাহ; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) ও আহমদ মুজতবা (দ.) মোবারক নামদ্বয়ের তাৎপর্য এবং সংস্কারসমূহ- আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন- ইবনে আবদুশ শাকুর; ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের তাৎপর্য- জাবেদ বিন আলম; পবিত্র কোরআনের আয়নায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য- আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল। শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে একনজরে: দেশে দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন শীর্ষক অ্যালবাম। নিঃসন্দেহে এই সংকলনের লেখকগণের অপরিসীম পরিশ্রমে, অতুলনীয় লিখনি, কোরআন, হাদিস ও বিশ্বসমাদৃত কিতাবাদীর অসাধারণ তথ্যসূত্র পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেক দিনের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

মাওলানা সৈয়দ আবুল ফজল মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সুলতানপুরী রচিত প্রবন্ধটির সার কথা ফুটে উঠেছে তাঁর রচনার শেষ কয়েকটি লাইনে- “সৃষ্টির আদি থেকে দৃশ্যমান জগতের

অবস্থান পর্যন্ত নবীজী (দ.) এর মিলাদুন্নবী (দ.) এর রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। যে কারণে নবীজী (দ.) এর জাহেরী তাৎপর্যকে অনুধাবন পূর্বক অনুসরণ হলো ইবাদত। যা হবে পারলৌকিক মুক্তির কারণ। নবীজী (দ.) এর মিলাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা মিলাদুন্নবী (দ.) এর দাবি। তাঁর ইত্তেবা এর মাধ্যমে ইহলৌকিক জীবন গঠন হওয়া চাই।”

প্রবীণ বুদ্ধিজীবী মো: মাহবুব উল আলম তাঁর রচনায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম মাইলফলক, সময়ধর্মী এবং অন্যায় আক্রমণাত্মক সহিংসতা বিরোধী প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদকে মানুষের চিরন্তন অধিকারের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অধ্যাপক জহুর উল আলম প্রিয় নবীর (দ.) পবিত্র সিরাতকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করে মহানবী (দ.) যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মহিমাময় যোগসূত্র এবং তাঁর পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিকতার অনির্বাণ স্রোতধারা হিসেবে জাগতিকতা এবং পারলৌকিকতা সমন্বিত জীবনব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ নির্দেশনা- তা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ অসংখ্য সর্বজন গ্রাহ্য বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর পক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

বিশিষ্ট কবি, চিত্র শিল্পী, গবেষক ও সাংবাদিক ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং তাঁর তাসাওউফ জীবনের পুণ্যছায়ায় সাহাবীগণের অবস্থান তুলে ধরে বিদায় হজের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেন- “মহানবী (দ.) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (দশম হিজরিতে) জীবনের প্রথম ও শেষ হজ পালন করতে গিয়ে জাবাল উল আরাফাতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সাহাবা কেলাম সহ উপস্থিত বিশাল জনসমুদ্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা যথাযথ ভাবে অনুধাবনে মুসলিম সমাজ কতোটুকু সমর্থ হয়েছে এই প্রশ্ন এখন উঠছে। বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (দ.) কেবল জাগতিক ও ব্যবহারিক জীবনের দিকনির্দেশনা দেন নি, উপরন্তু তাতে ছিলো প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাও। আল্লাহ প্রেম, আল্লাহর সৃষ্টির প্রেম, জীবনের শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, মানবতা, সাম্য, সামাজিক আইন সহ যাবতীয় বিষয় এ ভাষণে বিধৃত করেছেন নবী করিম (দ.)।”

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও লেখক মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর সংজ্ঞায়ন করে বলেছেন- “ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) হলো আল্লাহর প্রিয় হাবিব (দ.) এর পবিত্র জীবনী আলোচনা, খুশি উদযাপন এবং এতদুপলক্ষে মাহফিল ও আলোকসজ্জা, তাঁর পবিত্র জীবনী আলোচনা, তাঁর

উসওয়াতুন হাসানাহ বা মহান আদর্শ প্রতিফলনের প্রচেষ্টা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ও আয়োজন।” এছাড়াও তিনিও এর শরঈ দালিলিক ভিত্তির পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ সুন্দর সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামি চিন্তাবিদ ও সুফি গবেষক এস এম এম সেলিম উল্লাহর লেখায় ফুটে উঠেছে মিলাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ ও এর তাৎপর্য। এছাড়াও মিলাদুন্নবী (দ.) সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীগণের মন্তব্য, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য, ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর রাতের ফযিলত ইত্যাদি তিনি দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আহমদ ও মুহাম্মদ নামদ্বয়ের তাৎপর্য ও এর গূঢ় রহস্য সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন গবেষক আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী। সংক্ষেপে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর দালিলিক ভিত্তি বর্ণনা করে উদীয়মান গবেষক ইবনে আবদুশ শাকুর বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন- “নানা ধরনের মতবাদ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন ঘিরে মানব সমাজ আজ বহুধা বিভক্ত। এ সকল মতাদর্শ গুলোর মধ্যে অনেক মতবাদ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী এবং কোন কোনটি নৈরাশ্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী এবং অনৈতিকতাবাদী। এদের প্রচার-প্রোপাগান্ডাও বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। এ ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরাভূত করার জন্য নূর নবীর (দ.) সর্বজনীনতা ও বিশ্বশান্তির মতাদর্শকে প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর পবিত্র জন্ম দিবসে প্রকাশ্যে বিশাল গণ-জমায়েত এবং শোভাযাত্রা প্রদর্শনের আয়োজন করা সময়ের দাবি।”

গবেষক জাবেদ বিন আলমও বর্তমানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সর্বশেষ প্রবন্ধে মাইজভাগুরী একাডেমির সদস্য জনাব আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর হাবীব (দ.) এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিত্রণ করেছেন, যা পাঠক মহলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হবে।

বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ও গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় সংকলিত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য দলিল ভিত্তিক বক্তব্য, বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা, নতুন ধারার লেখনি, নিরপেক্ষ ভাবধারার কারণে সব বয়সের ও স্তরের পাঠকের মনের তৃষ্ণা নিবারণ করবে। গবেষকগণ এতে খুজে পাবেন গবেষণার নতুন সূত্র, আলেমগণ পাবেন মিলাদুন্নবী (দ.) ভিত্তিক দ্বীন তবলিগের নতুন দিকনির্দেশনা, শিক্ষিত শ্রেণি পাবেন অনেক প্রশ্নের সহজ জবাব এবং শিক্ষার্থীগণ পাবেন নতুন শিক্ষণীয় বিষয়।

একনজরে

মহান ১০ পৌষ ২০২১: বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৯৩তম পবিত্র খোশরোজ শরিফ



বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত 'তুরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র
প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ
মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ১১৬তম উরস শরিফ উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ
জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর

১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি ২০২২

তারিখ ও বার	অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনায়
২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারি ২০২২ শুক্রবার	চতুর্দশ শিশু-কিশোর সমাবেশ উপলক্ষে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ভেন্যু: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। সময় : সকাল ৯ টা।	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৩০ পৌষ ১৪ জানুয়ারি ২০২২ শুক্রবার	চতুর্দশ শিশু-কিশোর সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণী ভেন্যু: জিমনেসিয়াম মাঠ, এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম। সময় : দুপুর ২টা ৩০ মিনিট	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
১ মাঘ ১৫ জানুয়ারি ২০২২ শনিবার	বিশেষ সুফি সংগীতের ভার্চুয়াল আসর "মরমিয়া", সময় : রাত ৯টা ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/Maizbhandari Moromi Goshti	মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
২ মাঘ ১৬ জানুয়ারি ২০২২ রবিবার	মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন 'আলোর পথে' আয়োজিত ভার্চুয়াল মাহফিল বিষয় : শিশু-কিশোরদের নীতি-নৈতিকতাবোধ জাগরণে তাসাওউফ চর্চার ভূমিকা। সময় : সন্ধ্যা ৭টা ফেসবুক লিংক : www.facebook.com/sufialorpothe	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারি ২০২২ সোমবার	'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'-এর জীবনী আলোচনা, র্যালি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
৪ মাঘ ১৮ জানুয়ারি ২০২২ মঙ্গলবার	৮ম উলামা সমাবেশ ২০২২, ভেন্যু: এল জি ই ডি মিলনায়তন, এল জি ই ডি ভবন, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। বিষয়: আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আলেম সমাজের ভূমিকা	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৫ মাঘ ১৯ জানুয়ারি ২০২২ বুধবার	আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন ২০২২, ভেন্যু: বঙ্গবন্ধু হল, প্রেসক্লাব, চট্টগ্রাম। বিকাল ৪টা। বিষয়: স্ব স্ব ধর্মের আলোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৬ মাঘ ২০ জানুয়ারি ২০২২ বৃহস্পতিবার	শিক্ষক সমাবেশ ২০২২, ভেন্যু: সম্মেলন কক্ষ, গাউসিয়া হক মন্ডল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। সময় : সকাল ১০টা বিষয়: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং অপব্যবহারে ছাত্র-সমাজ ও তৎপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের ভূমিকা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৭ মাঘ ২১ জানুয়ারি ২০২২ শুক্রবার	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটিসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে খতমে কুরআন ও মিলাদ মাহফিল। মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন "The Message" আয়োজিত মহিলা মাহফিল। ভেন্যু: রয়েল গার্ডেন, মাওলানা মোহাম্মদ আলী রোড, চট্টগ্রাম। বিষয়: ইসলামে বিচারসাম্য : প্রেক্ষিত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা ফেসবুক লিংক : www.facebook.com/The Message-Know the whole truth not the half	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ "দি মেসেজ"
৮ মাঘ ২২ জানুয়ারি ২০২২ শনিবার	২০২১ পর্বে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তদের মাঝে বৃত্তির অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান। সময় : সকাল ১০টা। ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন।	বৃত্তি তহবিল পরিচালনা পর্ষদ
৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারি ২০২২ রবিবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানাসমূহের শিক্ষার্থীদের মাঝে একবেলা খাবার সরবরাহ	গাউসিয়া হক মন্ডল
১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারি ২০২২ সোমবার	জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রচার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ওয়ু এবং অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
১১ মাঘ ২৫ জানুয়ারি ২০২২ মঙ্গলবার	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি: প্রধান সড়ক হতে হযরত সাহেব কেবলার পুকুর পাড়। সকাল ৭টা।	গাউসিয়া হক মন্ডল ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট